নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ২০, পৃঃ ৫৩-৮৫
© ২০১৫ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সুলতানের বিউপনিবেশায়ন[১] ভাবনার তত্ত্বায়ন

সৈয়দ নিজার আলম*

সারসংক্ষেপ

এস. এম. সুলতান বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পীদের একজন। তার শিল্পকর্মে স্বতন্ত্র দর্শন, সমাজতত্ত্ব এবং নন্দন ভাবনা রয়েছে। আত্মসত্তার অন্বেষণ সুলতানের শিল্পকর্মে অন্যতম লক্ষ্য। তাই তার শিল্পকর্মের আঙ্গিকগত ও অঙ্কনরীতিতে দেশজ প্রভাব রয়েছে এবং বিষয় বস্তু ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবয়ান। সেকারণে তার কাজে বিউপনিবেশায়নের পদ্ধতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়; যা শুধু শিল্পের বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাব নয়, বরং জ্ঞানের যেকোন ধারার বিউপনিবেশায়নের পদ্ধতি হতে পারে। তিনি আমাদের চিন্তা ও শিল্পচর্চায় ঔপনিবেশিকতার ছাপগুলি খুঁজে বের করেছেন। যা বিউনিবেশায়নের প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু তিনি বিউপনিবেশায়নের নামে প্রাক-ঔপনিবেশিক দেশজ শিল্পধারায় ফিরে যাননি বরং দেশজ শিল্পচেতনার বৈশ্বিক রূপ দান করেছেন। সুলতানের বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাব বঙ্গীয় পুনজাগরণবাদ থেকেও অনন্য। ই. বি. হ্যাবেল, আনন্দ কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভেবেছেন ভারত শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য 'আধ্যাত্মিকতা'। আত্ম-পরিচয় নির্মাণের এই রাজনীতিকে দ্বি-বিচ্ছেদায়ন বলা যেতে পারে। সুলতানের শিল্পকলায় বি-বিচ্ছেদায়নের প্রস্তাব রয়েছে। একই সাথে তার শিল্পকর্মে রয়েছে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিবয়ান। এই প্রবন্ধে, আলোচিত হয়েছে– ভারত শিল্পের উপনিবেশায়ন, ই. বি. হ্যাবেল, আনন্দ কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিউনিবেশায়ন ভবনা ও তৎপরতা, এবং সুলতানের বিউনিবেশায়ন এবং বি-বিচ্ছেদায়ন প্রস্তাব।

১. প্রেক্ষাপট

এস. এম. সুলতান (১৯২৪-১৯৯৪) বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পীদের একজন। তিনি শুধু চিত্রশিল্পীই ছিলেন না– তাঁর স্বতন্ত্র দর্শন, রাজনীতি, সমাজ, নন্দন ভাবনা ছিল। যা একই সাথে দেশজ ও সময়ের চেয়ে অগ্রজ এবং জীবন যাপনের ক্ষেত্রে 'সহজিয়া'দের 'সহজ' হয়ে ওঠার অক্লান্ত প্রচেষ্টার স্মারক। যার চিন্তার ছাপ পড়তে পারত আমাদের ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ ও দর্শনচর্চাসহ জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কিন্তু তার চিন্তা জ্ঞানের অন্যান্য শাখা তো দূরের কথা, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের শিল্পচর্চা ও ভাবনায়

[১] ব্যকরণ মেনে শুদ্ধভাবে লিখলে বি-উপনিবেশায়ন বা ব্যুপনিবেশায়ন লেখা প্রয়োজন। লেখক সহজ যোগাযোগের লক্ষে বিউপনিবেশায়ন শব্দটিই রাখতে চেয়েছেন, লেখাটির সাম্প্রতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সম্পাদনা পরিষদ লেখকের আগ্রহকে সম্মান করেছে।

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইমেইলঃ nizaralam@gmail.com

কোন ধারাক্রম সৃষ্টি এমনকি গুরুত্বপূর্ণ কোন শিল্পীকে প্রভাবিত করতে পারেনি। বরং সুলতানের কাজ শিল্প সমালোচকদের কাছে অবোধগম্য ছিল বলে অবমূল্যায়িত হয়েছে। সুলতানের অন্যতম উদ্দেশ্য আত্মসত্তার অন্বেষণ। তিনি তাঁর চিত্রকর্মের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন দেশজ নন্দন তত্ত্ব ও শিল্পকলার রূপ। কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পকলা উপনিবেশের উত্তরাধিকার। আমাদের সমকালীন নন্দনভাবনা ও শিল্পকলা গভীরভাবে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পকলা দ্বারা প্রভাবিত। ফলে এদেশের শিল্পচর্চার ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সুলতানের কর্মে দেশজ শিল্পের যে রূপ ধরা পড়েছে তা এদেশের শিল্পরসিক ও শিল্পীগণ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সে কারণে সুলতানের কোন উত্তরসূরী নেই। নেই কোন ধারা। কিন্তু তার শিল্পকর্মে বিউপনিবেশায়নের পদ্ধতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়; যা শুধু শিল্পের বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাব নয়, বরং জ্ঞানের যেকোন ধারার বিউপনিবেশায়নের পদ্ধতি হতে পারে। তিনি আমাদের চিন্তা ও শিল্পচর্চায় ঔপনিবেশিকতার ছাপগুলি খুঁজে বের করেছেন। যা বিউনিবেশায়নের প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু তিনি বিউপনিবেশায়নের নামে প্রাক-ঔপনিবেশিক দেশজ শিল্পধারায় ফিরে যাননি বরং দেশজ শিল্পচেতনার বৈশ্বিক রূপ দান করেছেন। সুলতানের বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাব বঙ্গীয় পুনর্জাগরণবাদ থেকেও অনন্য। ই. বি. হ্যাবেল, আনন্দ কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভেবেছেন ভারত শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য 'আধ্যাত্মিকতা'। আত্ম-পরিচয় নির্মাণের এই রাজনীতিকে অনেকে চিহ্নিত করেছেন 'দ্বি-বিচ্ছেদায়ন' (Double Alienation)। সুলতানের শিল্পকলায় বি-বিচ্ছেদায়ন (De-Alienation) এর প্রস্তাব রয়েছে। একই সাথে তার শিল্পকর্মে রয়েছে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিবয়ান (Counter Discourse)। কিন্তু শিল্প সমালোচকদের অবোধগম্যতা ও বাংলাদেশের শিল্পচর্চায় কোন ধারাকে প্রভাবিত করতে না পারার ব্যর্থতার জ্ঞানতাত্ত্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ খোঁজাই এ লেখার উদ্দেশ্য। একই সাথে এই লেখায় আলোচিত হয়েছে সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা।

এই প্রবন্ধে প্রথম অংশে আলোচিত হয়েছে সুলতানের জীবন ও কর্ম এবং সমকালীন সমালোচকদের কাছে অবোধগম্যতার কারণ। আলোচনার ধারাবাহিকতার পরবর্তী অংশে ভারত শিল্পের উপনিবেশায়ন এবং বঙ্গীয় পুনর্জাগরণের প্রেক্ষাপট এবং ই. বি. হ্যাবেল, আনন্দ কুমার স্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার শেষাংশে সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রতিবয়ান এবং বি-বিচ্ছেদায়ন প্রস্তাব নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. জীবন ও কর্ম

এস. এম. সুলতানের জন্ম ১৯২৪ সালে আগস্ট মাসে নড়াইলের এক প্রান্তিক মুসলমান পরিবারে। তিনি চিত্রকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছেন কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে।

কিন্তু ডিগ্রি শেষ করার আগেই তিনি বেরিয়ে পড়েন ভারত ভ্রমণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি কাশ্মীরে ছিলেন এবং সেখানকার নৈসর্গ চিত্রায়নে মনোযোগী হন। যার অধিকাংশ তেল রঙে করা এবং সবই খুব রঙিন ও উচ্চকিত বর্ণিল। এসব ছবিতে গভীর বেগুনি রঙের পর্বত, বিচিত্র ঝোঁপঝাড় এবং বৃক্ষ, হ্রদ, নদী ও নৈসর্গের অংশ হিসেবে মানুষ চিত্রিত হয়েছে।

এরপর ১৯৪৭ সালে তিনি চলে আসেন করাচিতে। সেখানে তার একাধিক একক প্রদর্শনী তাকে খ্যাতির আলোয় উদ্ভাসিত করে। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি ইউরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণ করেন। এ সময়ে তাঁর শিল্পকর্মের একাধিক একক ও যৌথ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর এসব শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয় পিকাসো, কর্নেট, মাতিস, ডুফি, দালি এবং ক্লের মতো শিল্পীদের সাথে। এশিয়াতে তিনিই প্রথম– যার ছবি আধুনিক শিল্প গুরুদের সাথে প্রদর্শিত হয়।

এই অসাধারণ সাফল্যের পর বিদেশ থেকে তিনি ফিরে আসেন নড়াইলে। এ সময় গ্রামের শিশু-কিশোরদের আর্ট শেখানোর লক্ষ্যে তিনি যশোর ও নড়াইলে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই কালপর্বে তিনি প্রায় এক দশক আঁকা-আঁকি থেকে স্বেচ্ছাদূরত্ব বজায় রাখেন । পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালের দিকে ঢাকায় তাঁর পরবর্তী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যার ক্যানভাসগুলো ছিলো বিশাল, প্রায় ৩০-৪০ ফুট লম্বা। সদ্য স্বাধীন দেশের দর্শকদের কেউ তখনও এত বড় ক্যানভাস দেখেনি; এমন কি কল্পনাও করেনি। যা তৎকালীন শিল্পী ও শিল্পরসিকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সময় আঙ্গিকগত ও বক্তব্যগত দিক থেকে তার কাজের ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এখন তাঁর ছবির মূল বিষয়বস্তু নৈসর্গ থেকে সরে গিয়ে হয়ে ওঠে মানুষ– গ্রামের প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষ। তাদের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম; হাজার বছরের শোষণ-নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকার মহাবয়ান। চিত্রশিল্পী ও সমালোচক আবুল মনসুর সুলতানের পরিণত বয়সের সাথে তরুণ বয়সের কাজের তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন 'সুলতানের চিত্রকলা দৃষ্টিসম্মুখে প্রথম যে অভিঘাতটি তৈরি করে তা হলো একটি বিস্ফোরণোন্মুখ শক্তির প্রকাশ ও মন্যুমেন্টালিটি বা সমুন্নত ভাব। বিস্তীর্ণ গ্রামীণ পটভূমি নিয়ে আঁকা হলেও তাঁর ছবির মূল থিম মানুষ, প্রকৃতি এসেছে নেহায়েত পটভূমি বা অনুষঙ্গ হিসেবে।' [উদ্ধৃত হয়েছে– খান, ২০০৩: ৪৩]

পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে গ্যেটে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে সুলতানের একটি প্রর্দশনী হয়। এটি তার জীবনদ্দশায় শেষ প্রর্দশনী। ১৯৯৪ সালের ১০ আগস্ট তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৮৭ সালের প্রর্দশনী আমাদের শিল্প রসিকদের নজর কাড়ে। কিন্তু তাদের কাছে তিনি সব সময়ই আবোধ্য রয়ে গেছেন। বরং বাংলাদেশের শিল্পবোদ্ধা ও রসিকদের কাছে তার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক ধরা পড়েছে "অনাধুনিক" বা "নাইভ" হিসাবে। শিল্প রসিক এবং নগরপরিকল্পনাবিদ নজরুল ইসলাম তাকে কামরুল এবং জয়নুল আবেদিন এর সাথে তুলনা করতে গিয়ে বলেন–

> অবশ্য জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসান, উভয়েই সুলতানের তুলনায় প্রচলিত অর্থে অনেক বেশি ব্যাকরণসিদ্ধ আধুনিক ছবি এঁকেছেন। সুলতান সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবেই অনাধুনিক বা 'নাইভ' প্রকৃতির ছবি আঁকেন। (ইসলাম, ২০০৯: ১১০)

নজরুল ইসলাম সুলতানের অঙ্কন রীতিকে 'অনাধুনিক' এবং 'নাইভ' হিসাবে চিহ্নিত করেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ তাত্ত্বিক আধুনিকতাকে শুধু ধারা হিসাবে চিহ্নিত করেন না, তারা ভাবেন আধুনিকতা আমাদের সময়ের সার্বিক এবং বৈশ্বিক অভিব্যক্তি। তাই অনাধুনিক হওয়া মানে পিছিয়ে পড়া। আমাদের এই মনঃস্তত্ত্ব নির্মিত হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনামলে। সুলতানের কাজ সেই মনঃস্তত্ত্বের বিরুদ্ধে একটি বয়ান। তাই সুলতানের শিল্পচৈতন্য এবং বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব পাঠের জন্য প্রয়োজন ভারতীয় চিত্রকলার উপনিবেশায়ন এবং বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় পুনঃজাগরণবাদের বিউপনিবেশায়নের তৎপরতার ঐতিহাসিক পাঠ।

৩. ভারতীয় চিত্রকলার উপনিবেশায়ন

ইংরেজ শাসনামলের দুইশত বছর এবং উপনিবেশোত্তর কালে বৈশ্বিকতার নামে হাজির হওয়া আমেরিকান নব্য-সাম্রাজ্যবাদ উপেক্ষা করে এখানকার রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য এমনকি শিল্পচর্চার প্রবণতা এবং বাস্তবতা বোঝা সম্ভব নয়। ইংরেজ শাসনামলে শিল্প-সাহিত্যসহ আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউরোপীয় যে প্রভাব পড়েছে তা এখনও সক্রিয়। পাশ্চাত্যের চিন্তার ক্ষেত্রভূমি থেকে আমরা এখনও বের হয়ে আসতে পারিনি। তাই সুলতানসহ বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিনিধিত্বশীল শিল্পীর কাজের প্রবণতা এবং শিল্পচৈতন্য পাঠের জন্য প্রয়োজন বিগত আড়াইশত বছরের শিল্পসূত্রগুলো চিহ্নিত করা।

৩.১ কেমন উপনিবেশায়ন

সাধারণত উপনিবেশ বলতে আমরা বুঝি কোন জাতিগোষ্ঠীর অন্য কোন রাষ্ট্র অথবা জাতিগোষ্ঠীর উপর সরাসরি সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে ভূমি এবং অন্যান্য সম্পদের উপর সার্বিক অধিগ্রহণ করা। এ প্রক্রিয়াকে উপনিবেশায়ন বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ষোড়শ শতকের পর থেকে ইউরোপীয়দের হাত দিয়ে প্রথম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে রোমানদের আটলান্টিক থেকে আর্মেনিয়া পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন, চেঙ্গিস খান এবং তার বংশধরদের চীন থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত দখল। ষোড়শ শতকের পূর্ব পর্যন্ত সকল উপনিবেশের কোন সামান্য বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং তাদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে । কিন্তু ষোড়শ শতক উত্তর ইউরোপীয় উপনিবেশের চরিত্র পূর্ববর্তী যে কোন উপনিবেশ থেকে ভিন্ন। তা সুস্পষ্ট হয় দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর সংস্কৃতি, ভাষা এবং রাজনীতি বিশ্লেষণ করলে। উত্তর-উপনিবেশ তাত্ত্বিক ও. মেননি

(১৯৫০), এইমে সেজায়ার (১৯৫৫), আলবেয়ার মেমি (১৯৫৭), ফ্রাঁৎস ফানো (১৯৬১), এডওয়ার্ড সাঈদ (১৯৭৮) প্রমুখ ঔপনিবেশিক এবং উপনিবেশিতের উপনিবেশকালীন এবং উপনিবেশোত্তর পর্বে সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এই আলোচনায় বিতর্কও রয়েছে। ও মেননি ১৯৫০ সালে প্রকাশিত *Psychologie de la colonisation* বইয়ে ষোড়শ শতকে উত্তর ইউরোপীয় উপনিবেশের নতুন এক চরিত্র ইঙ্গিত করেন যা স্পষ্ট হয় পরবর্তী দুই দশকে। ইউরোপের বড় সংখ্যক তাত্ত্বিক এবং গবেষকদের কাছে উপনিবেশায়ন পাঠ সীমাবদ্ধ ছিল ভূমি অধিগ্রহণ, সম্পদের লুঠ, শারীরিক নির্যাতন এবং নিপীড়নে। সে কারণে ভাবা হয় উপনিবেশকদের হাত থেকে স্বাধীন হওয়ার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি হবে উপনিবেশায়নের। সমাপ্তি হবে এই কালো অধ্যায়ের। একই ভাবনা ছিল উপনিবেশিত গোষ্ঠীর নেতৃত্বের। সে কারণে প্রত্যক্ষ স্বাধীনতাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল যদিও তা অর্জনের লক্ষ্যে আন্দোলনের ভাষায় ভিন্নতা ছিল। ও. মেননি, মেমি ও ফানো তত্ত্বীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন প্রত্যক্ষ উপনিবেশের চেয়ে মনঃস্তাত্ত্বিক উপনিবেশের প্রভাব। তাদের মতে, উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রগুলোর উপর মনঃস্তাত্ত্বিক উপনিবেশবাদ জারি আছে। মনঃস্তাত্ত্বিক উপনিবেশের দুটি পর্যায় থাকে – (১) উপনিবেশিকদের জ্ঞানকাণ্ড নির্মাণ প্রকল্প যেখানে উপনিবেশিতের ইতিহাস ও বাস্তবতার বয়ান– যাতে সত্য থেকে সত্যভ্রম থাকে বেশি। (২) সেই জ্ঞানকাণ্ড প্রসার ও প্রচারের মধ্য দিয়ে উপনিবেশিতের চৈতন্য আধিপত্য বিস্তার। যার ফলশ্রুতিতে উপনিবেশিত আত্মবিশ্বাস যেমন হারায় তেমনি অনুকরণপ্রবণ হয়ে ওঠে।

ভারতীয় শিল্পকলা মনঃস্তাত্ত্বিক উপনিবেশায়নের শিকার হয়েছে এবং এর দুটি পর্যায়ও ছিল। কয়েক হাজার বছরে বিকশিত ভারতীয় শিল্পকলা, যা নিজস্ব অঙ্কনরীতি এবং বিষয়বস্তু আছে তা উনিশ শতকের প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণায় ধরা পড়লো 'CRAFT' হিসেবে। তাদের বিবেচনায় ভারতে চর্চিত শিল্প, ইউরোপীয় 'FINE ART' সমকক্ষ নয় এবং তার ধারাবাহিক কোন চর্চার ইতিহাস নেই। যা ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাস ও বাস্তবতার আংশিক সত্য বা সত্যভ্রম। যা ভিত্তি প্রদান করে দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ ভারতীয় শিল্পী ও শিল্পরসিকসহ অন্যান্যদের চৈতন্যে আধিপত্য বিস্তারের। ফলে পশ্চিমা এবং ভারতীয়দের চোখে যেমন এ দেশের শিল্পকর্ম অবমূল্যায়িত হয়েছে ঠিক তেমনি যৌক্তিকভাবে আবশ্যিক হয়ে পড়ে ইউরোপীয় শিল্পচর্চার। যা একই সাথে বিচ্ছিন্ন করেছে আমাদের ঐতিহ্য এবং অঙ্কনরীতি থেকে। কিন্তু এই বিজাতীয়করণ প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে বাংলা অঞ্চলের শাসনকার্য কোম্পানির হাতে নেওয়ার সাথে।

৩.২ কেন উপনিবেশায়ন

১৭৫৭ সালে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার উপনিবেশায়ন শুরু হয়নি। ১৭৬৫ সালে মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পায়। এই রাজস্ব আদায়ের অধিকারের মধ্য দিয়ে

উপনিবেশের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলশ্রুতিতে আইনি বৈধতা পায় উপনিবেশের সর্বোচ্চ হাতিয়ার বল প্রয়োগ এবং ভূমি নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে উৎপাদনকে প্রভাবিত করা। তা ছাড়া সকল প্রকার প্রত্যক্ষ উপনিবেশের চরিত্র তখন থেকে প্রকাশ পেতে থাকে [রনজিৎ গুহের, ১৯৮৮: ৪]। পরবর্তীতে যার উপর ভিত্তি করে মনঃস্তাত্ত্বিক উপনিবেশায়নের সূত্রপাত হয়। তার প্রভাব পড়ে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, দর্শন, শিল্প সাহিত্যসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। ভারতীয় শিল্পকলাবিষয়ক গবেষণা আঠার শতকের শেষের দিকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন (antiquities) অধ্যয়ন করতে গিয়ে শুরু হয়। এই আগ্রহের দুটি কারণ ছিল – (১) শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বাংলাসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, (২) আঠারো এবং উনিশ শতক থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বাজার মূল্যবৃদ্ধি।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অফিসারদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে ভারতসহ অন্যান্য উপনিবেশ সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করা শাসনকার্য পরিচালনার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তবে তা মানচিত্র তৈরি, যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তাঘাট নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এ অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি এবং মনঃস্তত্ত্ব অধ্যয়নের প্রয়োজন ছিল। সে কারণে শুরু হয় এই অঞ্চলের শিল্প, সাহিত্য, ভাষা, দর্শন ও ধর্মের অধ্যয়ন। এই অধ্যয়নকে কখনো চিহ্নিত করা হয়েছে 'ভারতবিদ্যা' বা 'প্রাচ্যবিদ্যা' বলে। এই ভারতবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে হেস্টিং বলেন, 'প্রত্যেক জ্ঞানই রাষ্ট্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয়। বিশেষত, আধিপত্যের মাধ্যমে যাদের বশীকরণ করা হয়েছে তাদের সাথে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন' (উদ্ধৃত হয়েছে– Stokes, 1959: 35-6)।

সে কারণে কোম্পানির অর্থ সহযোগিতায় উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল। ঔপনিবেশিক যুগে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি মজবুত করতে এশিয়াটিক সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। সোসাইটি আঠার শতকে বিপুল পরিমাণ গবেষণা বই প্রকাশ করে। সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী বই ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। একই সাথে এখানকার মানচিত্র তৈরি, প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনা করে। প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসের অংশ হিসাবে আমাদের প্রাচীন শিল্পকলা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। যার অনেকাংশ শাসনকাজে সহায়তা করেছে বলে মনে করেন গবেষকগণ।

প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যয়ন শুধুমাত্র শাসন ও শোষণ কার্য পচিালনার জন্য নয়। তার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। সোনা, রুপা, দামি পাথরের সাথে প্রত্ননিদর্শন (Antiquities)[1] লুট করে ইউরোপে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই অনুসন্ধান চালানো হত। এই লুট শুধুমাত্র ভারতবর্ষে হয়েছে তা নয়, তা একাধারে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য এবং ল্যাটিন আমেরিকায়ও ঘটেছে। কী পরিমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন লুট করে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার বয়ান পাওয়া যায় ঐতিহাসিক উইলিয়াম ডালরিম্পিল এর সদ্য প্রকাশিত গার্ডিয়ান সংবাদ পত্রের একটি নিবন্ধ থেকে–

> আঠারো শতকে ইস্টি ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত থেকে প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন লুট করে নিয়ে এসেছে। তা পয়িজ প্রসাদের কক্ষগুলোতে স্তুপ আকারে পড়ে আছে। আজও ভারতের যেকোন জায়গা, এমনকি দিল্লি জাদুঘর থেকেও থেকে বেশি মোঘল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে ওয়েলেস এর কোন কোন গ্রামের ঘরগুলোতে। (Dalrymple, 2015)[2]

'প্রত্ননিদর্শন' সাধারণত নির্দেশ করে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অংশ বিশেষ, সূত্রসাহিত্য, ভাস্কর্য, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন চিত্রকলা ইত্যাদি। অর্থাৎ যা কিছু ইউরোপে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলতা বাদে যা কিছু নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না তা পড়ে থাকতো অবহেলায়। তার বয়ান পাওয়া যায় কর্ণেল আলেকজান্ডার কানিংহামের লেখা চিঠি থেকে-

> ব্রিটিশ রাজত্বের একশত বছরে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো রক্ষার জন্য কিছুই করা হয়নি। এমনকি ইতিহাসও লিখা হয়নি। অথচ, সময়ের সাথে যুদ্ধ করে প্রতিদিন তাদের ক্ষয় হচ্ছে; এমন ভাবে চলতে থাকলে এগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাই দ্রুত তাদের লিখিত বিবরণ এবং ছবি আঁকে রাখা প্রয়োজন। (উদ্ধৃত হয়েছে– Guha-Thakurta, 2004: 3)

প্রত্ননিদর্শনগুলোর অধ্যয়ন প্রয়োজন ছিল এই লুট করা সম্পদের মূল্য নির্ধারণের জন্য। আঠার এবং উনিশ শতকে উপনিবেশের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ এবং তা পুনবিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত লগ্নির কারণে বিপুল অর্থভাণ্ডার তৈরি হয় ইউরোপে। এই অর্থ তখন বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হত। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত প্রত্ননিদর্শন ক্রয়। এই সকল প্রত্ননিদর্শনের মূল্য নির্ধারিত হত তার প্রাচীনতা ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে। সে কারণে প্রত্ননিদর্শন অধ্যয়নে পুঁজিবাজারের তাগাদাও ছিল। ফলে পরবর্তী একশত বছরে 'প্রত্ননিদর্শন অধ্যয়ন' প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানকাণ্ডে পরিণত হয়। যা থেকে পরবর্তীকালে জন্ম হয় কয়েকটি জ্ঞানকাণ্ডের। তারমধ্যে অন্যতম প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্যকলা এবং ইতিহাস।

৩.৩ ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে ভারত শিল্প

ভারতে শিল্পচর্চার দীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও সেই ইতিহাসের উপর কোন গ্রন্থ ছিল না। ফলে প্রত্ননিদর্শন অধ্যয়নই প্রথম ভারতের শিল্পকলার ইতিহাস নির্মাণ করে। সেই ইতিহাস প্রাচ্যবাদ, উপনিবেশের রাজনীতি এবং পুঁজির প্রভাবের বাইরে ছিল না। তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় উইলিয়াম জোন্স – এর ভারতীয় শিল্পকলার মূল্যায়ন থেকে। তিনি মনে করেন, ভারতীয় স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য শিল্প নয় বরং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মাত্র। তিনি মনে করতেন, প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের সাথে আফ্রিকার স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের মিল রয়েছে। তিনি বলেন, 'বর্তমানে টিকে থাকা ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যগুলো শিল্পের নিদর্শন নয়; এগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মাত্র। যা প্রমান করে অতীতে হয়তো এ দেশের সাথে আফ্রিকার সংযোগ ছিল' (Jones, William, 1799: 7)।

ঔপনিবেশিক আমলে দর্শন, সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞানের মত শিল্পকলাবিষয়ক ইউরোপীয়দের ভাবনা ভিন্ন ছিল না। তাদের মতে, ভারতে শিল্পচর্চার কোন ইতিহাস নেই। মিশর, গ্রিক এবং ব্যাবিলনের মত ভারতীয় চিত্রকলা, ভাস্কর্য জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। যা বস্তুগত সংস্কৃতি অধ্যয়নে সহায়ক কিন্তু তার কোন শিল্পমূল্য নেই। সে কারণে তার স্থান একমাত্র জাদুঘরে। আমেরিকান শিল্পরসিক হল্যান্ড কোটার, নন্দলাল বসুকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে– ভারতে বর্তমানে কোন শিল্পচর্চার সংস্কৃতি নেই। ভারতে শিল্পচর্চার ঐতিহ্য অতীত মাত্র। তাই তার স্থান জাদুঘর এবং নৃবিজ্ঞানীদের গবেষনার বিষয়। পশ্চিমা শিল্পই একমাত্র শিল্প; তৈল্য রং একমাত্র যর্থাথ মাধ্যম' (Cotter, 2008)।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারাবাহিক শিল্পচর্চার ইতিহাস থাকলেও সেই ইতিহাস গ্রন্থিত হয়নি। যদিও শিল্পবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ, যেমন নাট্যসূত্র (২য় শতক), কামসূত্র (২য় শতক) এবং চিত্রসূত্র (৭ম শতক) শিল্পতত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকলেও কোন ইতিহাস গ্রন্থ লেখা হয়নি। পূর্বেই আলোচনা হয়েছে আঠার শতকে শেষের দিকে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের শিল্পচর্চার ইতিহাস অধ্যয়ন শুরু হয়। জেমস ফার্গুসন (১৮১৮ – ১৮৮৬) এবং আলেক্সজান্ডার কানিংহাম (১৮১৪ – ১৮৭৩) এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাদের প্রত্ননিদর্শন অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে ভারত শিল্পের ইতিহাস নির্মাণ শুরু হয়। তাদের ভারত শিল্পের আলোচনা তুলনামূলক ইতিহাস, অর্থতত্ত্ব, ধর্মভিত্তিক শ্রেণিকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ফার্গসন এবং কানিংহামের ভারতশিল্পকলার ইতিহাস পাঠ ভারত শিল্পকে শুধুমাত্র অপরিপক্ক এবং আঞ্চলিক তথ্য-উপাত্তের সাথে বিযুক্ত ছিল তা নয়। ধারাবাহিক শিল্পচর্চার যে ঐতিহ্য ভারতে ছিল তা থেকে বিযুক্তিকরণে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের কাজের মধ্য দিয়ে ভারতশিল্প প্রথম পর্যায়ের উপনিবেশায়নের শিকার হয়। সেকারণে তাদের কাজ পাঠ ছাড়া ভারত উপনিবেশায়নের প্রক্রিয়া অর্থপূর্ণভাবে অধ্যয়ন সম্ভব নয় ঠিক তেমনি বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব নির্মাণে তাদের কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা আবশ্যক।

কানিংহাম পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ব্যক্তিগত আগ্রহেই ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি জোন্স এর মত মনে করতেন, ভারতে কোন শিল্পচর্চার ইতিহাস নেই এবং প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন ও ধর্মীয় কারণে এখানকার মানুষ বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের কারুকাজ তৈরি করেছে। ফলে ধর্মভিত্তিক শ্রেণিকরণ তার কাজের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি মনে করেন, এই সব কারুকাজ– যথাক্রমে ভাস্কর্য, দেয়াল চিত্র, স্থাপত্য কলার সাথে তত্ত্ববিদ্যার (অধিবিদ্যা) গভীর প্রভাব এবং তা ব্যাখ্যা করার মূলসূত্র হওয়া উচিত ধর্ম। তার এই ধর্মনির্ভর ব্যাখ্যা করার প্রবণতার কারণ হতে পারে, বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বই এর সঙ্গে পরিচিতি। তিনি তার উপর ভিত্তি করে বটগায়া, বরহুটসহ বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করেন। তার কাজ অনেক বেশি সার্ভে, পরিমাপ এবং সংরক্ষণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনিই

প্রথম ইন্ডিয়ান আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের পরিচালক পদে আসীন হন। তার কাজের মধ্যে পরবর্তীতে লুট হয়ে যাওয়া এবং অবহেলায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীন ভারতীয় নিদর্শনগুলোর তথ্য পাওয়া যায় যা বর্তমানে ভারত শিল্পের ইতিহাস নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু তার ভারত শিল্প পাঠে এখানকার নন্দনতত্ত্ব, সংস্কৃত সূত্র সাহিত্য একদমই প্রাধান্য পায়নি।

ফার্গসন ভারত শিল্পের একটি তুলনামূলক পাঠ উপস্থাপন করেন। সে কারণে তার ভারতশিল্পের ইতিহাস নির্মাণে তৎকালীন দুটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব– বিবর্তনবাদ এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রভাব অতন্ত লক্ষ্যণীয়। মানব সভ্যতার বিকাশ এবং শিল্পের বিকাশ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। জোন্স এবং কানিংহাম থেকে তাঁর অবস্থান ভিন্ন ছিল। তিনি মনে করতেন, প্রাচীন গ্রীস, মিশর এবং ভারতের স্থাপত্য কলা মৌলিক এবং রেনেসাঁ-উত্তর শিল্পচর্চা গ্রীক এবং রোমান শিল্পের অনুকরণ মাত্র। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পকলা রেনেসাঁ-উত্তর কালে অনুকরণ প্রবণতাকে ছাড়িয়ে গেছে। সে কারণে তা ভারতসহ প্রাচীন সকল শিল্প থেকে উন্নত। উন্নত শিল্পকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য বাস্তবতাকে উপস্থাপন করার ক্ষমতা। ভারত শিল্পে 'Lack of realism or naturalism' (Dhar, 2006: 4) সে কারণে তা অনুন্নত। সর্বোপরি তা সময়ের সাথে সাথে তার অবনতি হচ্ছে। সে সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভারতশিল্পচর্চাকে তিনটি পর্বে ভাগ করেন– বৌদ্ধ যুগ, ব্রাহ্মণ যুগ এবং মোঘল যুগ। তাঁর মতে, ভারতে সবচেয়ে বিকশিত পর্ব হচ্ছে বৌদ্ধ যুগ। কারণ গ্রিক ভাস্কর্যের সাথে গান্ধারের বৌদ্ধ মূর্তির মিল পাওয়া যায়। তাই প্রাচীন বৌদ্ধ ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যকলা তুলনামূলকভাবে বিকশিত। পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও মোঘল আমলে তার অবনতি হয়েছে মাত্র। তিনি মনে করতেন, ভারত শিল্পের বিকাশ হয়েছে আর্যদের আগমনের পরে এবং তাদের মাধ্যমে। ভারতে আর্যদের আগমন এবং তাদের প্রভাব তৎকালিন বুদ্ধিভিত্তিক তৎপরতায় বিশেষ প্রভাব ফেলে, বিশেষত ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে।

জার্মান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্স মুলার ১৮৬১ সালে রয়েল সোসাইটিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক এক বক্তৃতায় 'আর্য জাতি' (Aryan Race) শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন সংস্কৃত, ল্যাটিন এবং গ্রীক ভাষার কাঠামো ও শব্দগত মিল রয়েছে। তিনি এই ভাষাগুলোকে চিহ্নিত করেছিলেন 'ইন্দো-ইউরোপীয়ান' ভাষাগুচ্ছ হিসেবে এবং এই ভাষাগুলোর সুনির্দিষ্ট কোন উৎস ভাষা রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। এই ভাষাভাষীদের তিনি চিহ্নিত করেছিলেন 'আর্যজাতি'। পরবর্তিতে ম্যাক্স মুলারের ভাষাভিত্তিক 'আর্যজাতি তত্ত্ব'কে গবেষকগণ সমালোচনা করেছেন। (বিস্তারিত– Bryant & Patton, ২০০৫) এই আর্যতত্ত্ব ঔপনিবেশিক রাজনীতিসহ ইউরোপীয় রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালে, সমাজতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিকগণ 'আর্যতত্ত্ব'কে প্যারাডাইম গ্রহন মানব সমাজসহ শিল্প, সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যাসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যার প্রবণতায় পরিণত হয়। শিল্পের বিকাশ এবং বিবর্তন নিয়ে

ফার্গসনের *History of Architecture in all Conuntries* তারই উদাহরণ। তিনি অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারত শিল্পের আর্য-অনার্য শ্রেণিকরণ করেন। ফার্গসন এবং কানিংহামের আর্য-অনার্য শ্রেণিকরণ ও ধর্মভিত্তিক বিভাজন বঙ্গীয় পুনজাগরণসহ সমকালীন হিন্দুত্ব শিল্পআন্দোলনেও প্রভাব রয়েছে।

কানিংহাম এবং ফার্গুসন এর গবেষণা এখনকার শিল্প শাস্ত্র এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেয়া হয়নি। তাদের লেখা নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে ই. বি. হ্যাবেল এবং অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বলেছেন, তাদের আলোচনা অনেক বেশি মাপজোখনির্ভর । পাশ্চাত্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখার কারণে এ অঞ্চলের শিল্পকলার স্বতন্ত্রতা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সর্বোপরি তাঁদের আলোচনায়, ভারতীয় ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা কখনো পাশ্চাত্য 'Fine Art' এর সমকক্ষ হতে পারেনি, 'Craft' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পরবর্তীকালে, জস বোরসে, জে. ডি. এস. বেগলারদের কাজে ভারতের অঙ্কনরীতি এবং অবয়ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকলেও তাঁদের কাজেও ভারতীয় ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা 'Fine Art' এর মর্যাদা পায়নি।

ভারত শিল্পের ইতিহাস নির্মাণের এই রাজনীতি, বৃহত্তর ঔপনিবেশিক রাজনীতির আলোকে পাঠ করা প্রয়োজন। ঔপনিবেশিক রাজনীতির অন্যতম প্রবণতা ছিল উপনিবেশিতকে অধঃস্তন করা। তার পরিব্যাপ্তি সামরিক এবং অর্থনৈতিক সমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তা ছড়িয়ে পড়ে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সেই সময়কার ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডে উপনিবেশিতকে উপস্থাপনের রাজনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকগণ। তাঁদের মতে, উপনিবেশিতের কোন জ্ঞানকাণ্ড, ইতিহাস, শিল্প, দর্শন চর্চার ইতিহাস নেই। তাই তাদের নিজে নিজের দায়িত্ব নেয়ার ক্ষমতা নেই। বয়ান তৈরির মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ড তার উপনিবেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং নৈতিক বৈধতা খোঁজে। তারই অংশ হিসেবে ভারতীয় 'শিল্প'কে 'কারুকাজ' বলে চিহ্নিত করার প্রবণতা বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু আরো গভীর প্রভাব রয়েছে। জ্ঞানকাণ্ডের উপনিবেশায়ন আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে। উপনিবেশিত নিজেদের দুর্বল এবং হীন মনে করে। যা মনঃস্তাত্ত্বিক উপনিবেশায়নের উদাহরণ। ফলে উপনিবেশিত মানসিকভাবে ঔপনিবেশিক শক্তিকে যেমন গ্রহণ করে, তেমনি ঔপনিবেশিক শক্তির সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের অনুকরণই উন্নয়নের একমাত্র সোপান মনে করে [Bhabha, 1994]। তখন উপনিবেশের জ্ঞানকাণ্ডকে ছেদ করা ক্ষমতা এবং সাহস থাকে না। আফ্রিকার বিউপনিবেশায়ন তাত্ত্বিক নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো এ প্রসঙ্গে বলেন,

> .... সাংস্কৃতিক বোমা সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র, যা প্রতিদিন ক্ষেপন করা হয় সামষ্টিক প্রতিরোধের বিরুদ্ধে। এই সাংস্কৃতিক বোমা তাদের আত্মবিশ্বাস, তাদের ভাষা, তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাদের প্রতিরোধের ঐতিহ্য, তাদের একতা, তাদের ক্ষমতা, এমন কি তাদেরকে ধংস করে দেয়। সর্বপরি, সাংস্কৃতিক বোমা তাদের অতীতকে অর্জনহীন

> পতিত ভূমি রূপে তাদের সামনে উপস্থাপন করে। ফলে, তাদের কামনা তৈরী হয় এই পতিত ভূমি থেকে নিজের বিচ্ছেদ ঘটানোর। (Thiong'o, 2007: 3)

উপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে উপনিবেশিতের ইতিহাস ও বাস্তবতার যে সত্যভ্রম নির্মাণ করে তা মনঃস্তাত্ত্বিক উপনিবেশের দ্বিতীয় পর্যায়ে চৈতন্যে আধিপত্য বিস্তারের ভিত্তি প্রদান করে। নগুগি চৈতন্যে আধিপত্য বিস্তারের দুটি লক্ষণের কথা এখানে বলেছেন – (১) উপনিবেশকের সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্যসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অতি মূল্যায়ন, (২) তা অনুকরণ প্রবণতা। ভারতের শিল্প চর্চায় যার ব্যত্যয় ঘটেনি।

৩.৪ আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং রুচির পরিবর্তন

১৮৫৪ সালে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে School of Industrial Arts প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে শিল্পকলা চর্চাকে প্রণোদনা দেয়ার উদ্দেশ্য এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। ব্রিটিশ সরকারের শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে রাস্তা-ঘাট, ইমারতসহ বিভিন্ন কাজের জন্য নকশাকার, নকশা অঙ্কনকারী, সমীক্ষণকারী, খোদাইকার এবং লিথোগ্রাফার প্রয়োজন ছিল। তাই, এই প্রতিষ্ঠানের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়াই মূল উদ্দ্যেশ্য ছিল (Guha-Thakurta, 2004: 143)। পরবর্তীকালে ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি সরকার অধিগ্রহণ করে এবং নতুন নামকরণ করা হয় The Government School of Arts। তখন হেনরী লক অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনি পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনেন। কিন্তু তখনও ভারতীয় শিল্প প্রসঙ্গে কোন পাঠ দেওয়া হত না। বরং ব্যবহারিক শিল্পের গুরুত্বারোপ করা হত। উনিশ শতকে যখন জ্ঞানগত ও বস্তুগত কারণে জ্ঞানের সকল শাখার বিজ্ঞান হয়ে ওঠার প্রবণতা বিদ্যমান ছিল তা থেকে শিল্পকলাও মুক্ত থাকেনি। বাস্তব জগত উপস্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তা শিল্পের প্রগতির নির্ণায়কে পরিণত হয়। সে কারণে, আর্ট কলেজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো বাস্তববাদী শিল্পের। পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) নির্ভর অঙ্কনরীতি বাস্তববাদী শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ভারতীয় শিল্পকলা ভাবনির্ভর, সে কারণে পরিপ্রেক্ষিত কখনোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। একই সাথে তা অনেক সময় ভাব সঞ্চালনের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে। মোটকথা, বাস্তববাদী পাশ্চাত্য শিল্পের শিক্ষা দেয়া হত এই প্রতিষ্ঠানে। ফলে, ভারত শিল্পের উপনিবেশায়নের শুরু হয়েছিল ফার্গসন এবং কানিংহামের ভারত শিল্পের সত্যভ্রম তৈরির মধ্য দিয়ে। তা নতুন মাত্রা পায় আর্ট কলেজের পাশ্চাত্য অঙ্কনরীতি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

কিন্তু, ভারত শিল্পের উপনিবেশায়নের প্রভাব শুধুমাত্র ভারত শিল্পকে 'ART' এর মর্যাদা না দেওয়ার এবং ভারতে পাশ্চাত্য শিল্পরীতি প্রশিক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তার প্রভাব পড়ে সামগ্রিক জীবনে। তা সৃষ্টি করে নতুন এক সৌন্দর্য ভাবনা। সৃষ্টি করেছিল নতুন জীবন কামনা। ঐতিহ্যকে ছেদ করে নতুন ভিন্ন কোন ব্যক্তি হয়ে

ওঠার প্রবণতা। যা পরিবর্তন করেছিল রুচিবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির। তা ইঙ্গিত পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের আর্য জাতির সূক্ষ্ম শিল্পবিষয়ক লেখায় এবং রাজা রাবিবর্মার ছবিতে।

> কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্র এই ছয়টি সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা। ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে তাহার অনুবাদ করিয়া 'সুক্ষ্মশিল্প' নাম দেওয়া হইয়াছে। সৌন্দর্য প্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন বাঙ্গালির কপালে এ সুখ নাই। সূক্ষ্মশিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ। তাহাতে বাঙ্গালির বড় অনাদর, বড় ঘৃণা, বাঙ্গালি সুখী হইতে জানে না। [চন্দ্র, ৪২]

বঙ্কিমের লেখা এবং রাজা রাবিবর্মার (*A portrait of Mahaprabha Thampuratti of Mavelikk ara*: ১৮৯৬) ছবি আমাদের নিশ্চিত করে ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী ভারত শিল্প চর্চাকে ঐতিহ্য থেকে শুধু বিচ্ছিন্নই করেনি, আমাদের রুচি-অভিরুচি জীবনভাবনা থেকেও বিচ্ছিন্ন করেছে। তারা হয়ে উঠেছে মেকলের সেই ভারতীয়, যারা দেখতে ভারতীয় কিন্তু ভাবনায় ইউরোপীয় (Macauley,1835)। যা উপনিবেশায়নের সর্বগ্রাসী চরিত্রের নিদর্শন।

৪. ঔপনিবেশিক আমলে বিউপনিবেশায়ন প্রবণতা ও তৎপরতা

উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া সচল থাকা অবস্থায়ই বিউপনিবেশায়নের তৎপরতা শুরু হয়। এই প্রতিরোধের ভিত্তি কখনো প্রাক-ঔপনিবেশিক চিন্তাকে আঁকড়ে ধরে হয় অথবা প্রাক-ঔপনিবেশিক চিন্তার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে হয়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়া বিপজ্জনক এবং আত্মসত্তা থেকে বিচ্ছেদের প্রবণতা থাকে। উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারত শিল্পের যে বিউপনিবেশায়ন শুরু হয়েছে তা এখনও জারি আছে। ভারত শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রাক-ঔপনিবেশিক শিল্পরীতিতে ফিরে যাবার যেমন প্রবণতা ছিল, ঠিক তেমনি রূপান্তরের প্রবণতাও বিদ্যমান ছিল। এদের মধ্যে শ্যামচরণ শ্রীমান, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দ কুমারস্বামী, ই. বি. হ্যাবেল এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাজ উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের কাজের সামান্য ভাবনা পাওয়া কঠিন হলেও ভারত শিল্পচর্চা বিষয়ক ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তারা একমত ছিলেন না। আঠারো শতকের ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডের নতুন সংযোজিত শব্দ 'Fine Art' - এর অন্তর্গত ভারতসহ ইউরোপের বাইরের কোন অঞ্চলের শিল্পচর্চা নয়। সে বিষয়ে তাঁদের মত–অভিমত অভিন্ন কিন্তু ভারতশিল্পের ভবিষ্যৎ বিকাশ প্রশ্নে তাঁদের অবস্থান ভিন্ন। জে গার্ফিল্ড সেই সময়ের প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'পশ্চিমা দৃষ্টিতে ভারত শিল্প আদিম, আলঙ্করিক ও কামোদ্দীপক এবং তা একটি ব্যর্থ নন্দন প্রকল্প। শিল্পী ও শিল্পরসিকগন

এই সমালোচনার উত্তর দিয়েছেন বিভিন্ন ভাবে। কেউ পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করার মধ্যদিয়ে, আবার অন্যকেই অনুপ্রেরনা নিয়েছেন প্রাচ্য থেকে' (Bhushan and Garfield, 2011: xix)।

শ্যামচরণ ও রাজা রাবিবর্মা পশ্চিমা অঙ্কনরীতি অনুকরণ করার মধ্য দিয়ে ভারত শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব বলে মনে করেছেন। অন্যদিকে কুমারস্বামী, হ্যাবেল এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেছেন ভারত শিল্প তখনই বৈশ্বিক ইতিহাস এবং শিল্পকলায় অবদান রাখতে পারবে যখন তার ভিত্তি প্রাক-ঔপনিবেশিক শিল্পচৈতন্য হবে। আপাতত মনে হতে পারে, শ্যামচরণের ভারত শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প উপনিবেশিতের বৈশ্বিক এবং আত্মসত্তার টানাপড়েনের বাইরে বের হতে পারেনি। কিন্তু ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড ভারত শিল্পকে 'সূক্ষ্ম শিল্পের' মর্যাদা দেয়নি। তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে তাদের জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে থেকে প্রতিবয়ান দাঁড় করিয়েছেন তা বিউপনিবেশায়ন তৎপরতার অংশ। তাই ভারত শিল্পের বিউপনিবেশায়ন তৎপরতার অংশ হিসেবে শ্যামচরণ, কুমারস্বামী, হ্যাবেল, অবনীন্দ্রনাথের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব এবং তার সংকট নিচে আলোচিত হয়েছে– যা সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনার পরিপক্বতা বুঝতে আমাদের সহায়তা করবে।

৪.১ শ্যামচরণ

শ্যামচরণ কলকাতা সরকারি আর্ট কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন এবং আর্ট কলেজে প্রথম ভারতীয় শিক্ষক। ১৮৭৪ সালে তিনি বাংলা ভাষায় 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্প' নামে ছোট একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তা ছিল বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম শিল্পবিষয়ক রচনা। যদিও রচনাটি কালের গহ্বরে হারিয়ে যায় কিন্তু বিউপনিবেশায়ন বিষয়ক আলোচনায় তার গুরুত্ব রয়েছে। শ্যামচরণ মূলধারার ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বের হয়ে ভারত শিল্পের ইতিহাস রচনা করেন এবং প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন পাশ্চাত্যের ন্যায় ভারতীয় ভাস্কার্য, চিত্র ও স্থাপত্য যা সূক্ষ্ম শিল্পের দাবিদার। যদিও পাশ্চাত্যের শিল্প সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয়েছে; কিন্তু ভারত শিল্প হয়নি। শ্যামচরণ ভারতশিল্পের ইতিহাস রচনায় জেমস ফার্গুসনের *History of Indian and Eastern Architecture* এবং হেনরী কলের *Catalogue of the objects of Indian Art Exhibited in the South Kensington Museum* বইয়ের উপর নির্ভর করেছেন। তপতি গুহ ঠাকুরতা হেনরী কলের বইকে 'The very first history of Indian art (Guha-Thakurta, 2004: 145) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন । ফার্গুসন এবং কলের গবেষণা পদ্ধতি মুলারের 'আর্যজাতি তত্ত্ব' এবং জার্মান ঐতিহাসিক ভিঙ্কিলেমানের শিল্পকলার বিবর্তনতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। সে কারণে শ্যামচরণের লেখা আর্যজাতি তত্ত্ব এবং শিল্পকলা বিবর্তনবাদে শুধু প্রভাবই ছিল না। তিনি এই দুই তত্ত্বকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আর্যদের হাত ধরে ভারতে শিল্পচর্চা এসেছে এবং প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য, চিত্র ও স্থাপত্য যা আর্যজাতি

চর্চা করেছে তা শুধু 'সূক্ষ্ম শিল্প'। সেই চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় মুসলমানদের আগমনের আগ পর্যন্ত। ফার্গুসনসহ অন্যান্যদের কাছে কারা আর্যজাতি – এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকলেও তিনি বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণদের আর্যজাতি বলে চিহ্নিত করেন। একই সাথে তিনি মনে করেন, পাশ্চাত্যের শিল্পধারা বিকাশমান কিন্তু আমাদের শিল্পধারা নিম্নগামী। কালিঘাটের পটচিত্র এবং বটতলার চিত্র প্রাচীন আর্য শিল্পের বিকৃত রূপ, যেমনটা যাত্রা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের বিকৃত রূপ। শ্যামচরণের লেখায় ধরা দিয়েছে সমৃদ্ধশালী অতীত এবং বিপর্যস্ত বর্তমান। বিপর্যস্ত বর্তমান থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন পাশ্চাত্যের অনুকরণ। ১৮৬৯ সালে হিন্দু মেলায় তিনি ভারতীয় শিল্পকলার এক প্রদর্শনীতে নবীনদের ভারতশিল্পের প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান এবং তা পাশ্চাত্যের অনুকরণের মধ্য দিয়ে। কলকাতার ঔপনিবেশিক মনঃস্তত্ত্ব গ্রহণের পেছনে আধুনিক হয়ে ওঠাই একমাত্র কারণ ভাবা ভুল হবে, বৈষয়িক কারণও ছিল। কলকাতার অর্থনীতি, মধ্যবিত্তের জীবন এবং জীবিকা অনেকাংশে ব্রিটিশ সরকারি চাকুরীনির্ভরশীল ছিল। তাই, ব্যবহারিক শিল্পের নামে ড্রয়িং, মানচিত্র অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল তার বৈষয়িক তাগিদ উপেক্ষা করা শ্যামচরণের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তপতী গুহ শ্যামচরণের উন্নয়ন ভাবনা প্রসঙ্গে বলেন, 'While India's past figured as a source of pride and autonomy, the present incited a desire or self-improvement and progress on the colonial model. (Guha-Thakurta, 2004: 3) শ্যামচরণের আধুনিকতা, প্রগতি এবং ঐতিহ্যবিষয়ক ভাবনা উনিশ শতকের সাহিত্যিক, দার্শনিকসহ অনেকের চিন্তায় দেখা যায়। সেই সময়কার দার্শনিক অরবিন্দ ঘোষ বলেন-

> ভারত ক্ষমতা আছে বিকশিত হওয়ার এবং মানব সভ্যতার উন্নয়নে ভূমিকা রাখার। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সংকীর্ণ ও অন্ধভাবে সকল নতুন আলোকে প্রত্যাখ্যান করবে। এমন কি তা যদি হয় পাশ্চাত্যের উদ্ভাবন এবং ক্ষমতা দিয়ে তার প্রসার ঘটানো হয়ে থাকে। এ ধরনে প্রত্যাখ্যাত হবে দার্শনিক ভাবে অযৌক্তিক, বৈষয়িক ভাবে অসম্ভব এবং তা আধ্যাত্মিকভাবে গ্রহণ নয় বলে। সত্য আধ্যাত্মিকতা কখনো নতুন আলোকে প্রত্যাখান কওে না। তার অর্থ হলো– আমরা আমাদের কেন্দ্রকে ধরে রেখে নতুন সবকিছুকে অঙ্গীভূত করে বিকশিত হব। (Aurobindo, 1918: 64)

কুমারস্বামী (১৯১০, ১৯২৪) অরবিন্দর এই ভাবনাকে সমালোচনা করে বলেন, অরবিন্দ বুঝতেই পারেননি পাশ্চাত্য আমাদের ভাবনার কেন্দ্রই পাল্টে দিয়েছে। শ্যামচরণের লেখার সাথে কুমারস্বামী হয়তো পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু কুমারস্বামী শ্যামচরণের একই সমালোচনা করতেন।

শ্যামচরণ ভারত শিল্পের উপস্থাপনের রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং প্রতিবয়ান উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উন্নয়ন পরিকল্পনা উপনিবেশায়নের বৃহৎ রাজনীতির গহ্বরে পতিত হয়। শ্যামচরণের বইয়ের ভূমিকায় লক লিখেন–

'আপনি ভারতের যে শ্রেণীর মনোযোগ নেয়ার চেষ্টা করছেন তাদের জ্ঞান এবং শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম মাতৃভাষা ....তাই বলা চলে আপনার এই উদ্যোগ ভারতে শিল্পশিক্ষা বিস্তারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ' (উদ্ধৃত হয়েছে– Guha-Thakurta, 2004: 141-142)। লকের দৃষ্টিতে শ্যামচরণ সেই ভারতীয়দের একজন– যাদের চৈতন্য ইউরোপীয় কিন্তু দেখতে ভারতীয়। টমাস মেইকলে মনে করতেন, শ্যামচরণের মত লোক ইংরেজদের চিন্তাকে কোটি কোটি ভারতীয়দের কাছে পৌঁছে দেবে (Macauley, 1835)[৩]। শ্যামচরণের উন্নয়ন প্রকল্প উপনিবেশিত কিন্তু ভারত শিল্পের ইতিহাস বিনির্মাণে বিউনিবেশায়নের প্রবণতা বিদ্যমান।

৪.২ হ্যাবেল, কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথঃ উপনিবেশিত ভারতের আত্মপরিচয় নির্মাণের উপাখ্যান

আঠারো শতকের শেষার্ধে ব্রিটিশদের অর্থায়নে মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ ও কলকাতার আর্ট কলেজে ব্রিটিশ সিলেবাস পঠনের কারণে ছাত্ররা পাশ্চাত্যের অঙ্কনরীতি ও টেকনিক আত্মস্থ করতে থাকে। ফলে দেশজ অঙ্কনরীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। সর্বোপরি শ্যামচরণ, চারুচন্দ্র নাগের লেখার কারণে এ অঞ্চলের নন্দন ভাবনা এবং রুচির পরিবর্তন হতে থাকে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উপনিবেশায়নের প্রভাব শুধুমাত্র বিষয়বস্তু চয়নে সীমাবদ্ধ থাকে না। হ্যাবেল, কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথ মনে করতেন পাশ্চাত্য শিল্পরীতি অনুকরণের মধ্য দিয়ে ভারত শিল্প বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। অবনীন্দ্রনাথ বলেন,

> আর্ট স্কুলে প্রাচীন গ্রিক রোমানমূর্তির মাটির ছাঁচ এবং ইউরোপীয় চিত্রকলার মাঝারি গোছের সস্তা নমুনা থেকে নকল নিয়ে নিয়ে আমাদের দেশে শিল্প-শিক্ষার্থীদের করে তোলা হচ্ছে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অয়েল পেইন্টার, ওয়াটার কালার পেইন্টার, নকল র‍্যাফেল, এবং টিশিয়ান হয়ে উঠবার অভিনয় চলছে, যেন বাঙালি ছেলে ব্রুটাস সেজে মুখস্থ করা স্পীচ আউড়ে যাচ্ছে আর ভাবছে নিজেকে সত্যই রোমান সেনেটরদের একজন। (ঠাকুর, ২০১২(২): ১৭৪)

হ্যাবেল, কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, ভারতীয় শিল্পীদের বিশ্বশিল্পে অবদান রাখতে হলে তাঁদের প্রাক-ঔপনিবেশিক অঙ্কনরীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। হ্যাবেল ১৮৮৬ সালে কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। সেই সময় থেকে তিনি মনে করতেন ভারতের শিল্পচর্চার ধারা পশ্চিমা ধারা থেকে স্বতন্ত্র কিন্তু তা তত্ত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারছিলেন না। সে সময়ে সুস্পষ্ট হয়নি কিভাবে ভারত চিত্র কৌশল ও পদ্ধতি পাশ্চাত্য থেকে ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র। তার উত্তর আসে অবনীন্দ্রনাথের ১৯০৯ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে হ্যাবেলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত 'ভারত শিল্প' শিরোনামের একটি প্রবন্ধ থেকে।

কুমারস্বামী এবং অবনীন্দ্রনাথের কাছে ভারত শিল্পের পাঠ শুধুমাত্র জ্ঞানতাত্ত্বিক আগ্রহের বিষয় ছিল না। তার সাথে যুক্ত ছিল উপনিবেশের প্রতিরোধ ও জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ। 'ভারতশিল্প' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ ভারতের শিল্প ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করেছেন। একই সাথে আধুনিকতা এবং প্রগতির মাঝে আটকে পড়া শ্যামচরণ এবং চারুচন্দ্র নাগ উন্নয়ন প্রকল্পের থেকে ভিন্ন প্রস্তাব দেন। অবনীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রাচ্যতত্ত্বের মধ্যে থেকেও জাতীয় শিল্পকলার চরিত্র অনুসন্ধান প্রয়োজন এবং তা চর্চার মধ্য দিয়েই শুধু ভারত শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব। এ প্রসঙ্গে কুমারস্বামী মনে করেন, পাশ্চাত্য আধিপত্যশীল জ্ঞানকাণ্ড এবং ক্ষমতা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন বোধে প্রাচ্যবাদ থেকেও নেওয়া উচিত। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের অবস্থান ভিন্ন। তিনি মনে করেন শিল্পকলার জাতীয় চরিত্র রয়েছে । এ প্রসঙ্গ বলেন, 'সব মানুষ এক রকম নয়; এক এক জাত এক এক রকম খাচ্ছে, পড়ছে, চলছে এবং ভাবছেও, এক এক জাতির বাহিরের চালচোল রকম-সকম এবং জাতির অন্তরের ভাবনা-চিন্তা দুইয়ের মিশে উৎপন্ন হয় শিল্পের মধ্যে দেশীয় জাতীয়তা।' [ঠাকুর, ২০০৫: ১৭১]

আধুনিকতাকে স্থান-কাল-পাত্রনির্ভরশীল নয় বলে ভাবা হয়। কিন্তু উত্তর-আধুনিকতাবাদ আমাদের বুঝতে সহায়তা করেছে আধুনিকতা পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি থেকে বিকশিত এবং আবর্তিত। তা সব সমাজ এবং সময়ের সর্বজনীন অভিব্যক্তি নয়। শ্যামচরণ যে আধুনিকতাকে সার্বিক এবং সর্বজনীনভাবে গ্রহণ করেছেন, অবনীন্দ্রনাথ তাকে চিহ্নিত করেছেন স্থানিক এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হিসেবে। একই সাথে তিনি মনে করেন ভারতীয় শিল্প চর্চারও সার্বিক চরিত্র রয়েছে। এই চরিত্র অনুসন্ধানে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন জাপানী শিল্পরসিক এবং ঐতিহাসিক কাকুঝো ওকাকুরা (Kakuzo Okakura) এর ১৯০৩ সালে প্রকাশিত *The Ideals of the East* গ্রন্থ থেকে। ওকাকুরার সাথে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল এবং তিনি কিছুকাল জোঁড়াসাকোর ঠাকুরবাড়িতে ছিলেন। এই গ্রন্থের আপন (নিজ) ও অপরের পরিচয় নির্মাণের রাজনীতি এবং প্রাচ্যবাদের তত্ত্ব নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডে প্রাচ্যের পরিচয় 'নিম্নগামী জাতিগোষ্ঠী', যাদের প্রাচীন সুউজ্জ্বল ছিল। কিন্তু ওকাকুরা তার বইয়ের প্রাচ্যের শিল্পের আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। তিনি উপস্থাপন করেন, প্রাচ্য কোনো নিম্নগামী সভ্যতা নয়; বরং তা আধ্যাত্মিকতার প্রজ্ঞায় পূর্ণ প্রবাহমান সভ্যতা। এই আধ্যাত্মিকতাই হওয়া উচিত পাশ্চাত্যের বস্তবাদী-ভোগবাদী সংস্কৃতিকে প্রতিরোধের ভিত্তি। এই ভোগবাদী-বস্তবাদী সংস্কৃতি রেনেসাঁ–উত্তর ইউরোপের জীবন ও সংস্কৃতিকে গভীর সংকটে নিয়ে যায়। তাই হ্যাবেল মনে করেন, এই আধ্যাত্মিকতাই প্রাচ্যের সক্রিয় টিকে থাকার ভিত্তি (Havell, 1920)। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণি যারা জীবন এবং জীবিকার তাগিদে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণে এখানকার সংস্কৃত ভাষায় রচিত জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন এবং একই সাথে শহর ও গ্রামের সাংস্কৃতিক দূরত্বের কারণে হাজার বছরের প্রবহমান লোকজ সংস্কৃতি থেকেও বিচ্ছিন্ন। কিন্তু জাপানের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। তাদের

প্রতিনিধিত্বশীল মধ্যবিত্তের সংস্কৃতির সাথে লোকজ সংস্কৃতির দূরত্ব কম থাকার কারণে তারা প্রবহমান সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

ফলে মূলধারার সংস্কৃতি প্রাচীন জাপানের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার কারণে পাশ্চাত্যকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা প্রবহমান সংস্কৃতির মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। তাই ওকাকুরা ভেবেছেন জাপানের 'আধ্যাত্মিকতা' পাশ্চাত্যকে প্রতিরোধ করার ভিত্তি হতে পারে। কিন্তু কলকাতার প্রতিনিধিত্বশীল অংশ তার লোকজ এবং প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে অবনীন্দ্রনাথ ভেবেছেন, 'আধ্যাত্মিকতা' ভিত্তি করেই আমরা প্রাক-ঔপনিবেশিক চৈতন্যে ফিরে যেতে পারি। আর সে কারণে জাপানের কাছে আধ্যাত্মিকতা পাশ্চাত্যকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হলেও তা কলকাতার পুণর্জাগরণ বা রেনেসাঁসের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় অবনীন্দ্রনাথ এবং হ্যাবেল ভারত শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে আধ্যাত্মিকতাকে চিহ্নিত করেন। হ্যাবেল বলেন,

> মানব বা দেবতার শিল্পকর্ম সবসময় 'আধ্যাতিকতা'কে প্রকাশ করে, 'শক্তি'কে নয়। ভারতীয় শিল্পীরা এই অনুপ্রেরনা নিয়েছেন আর্য দর্শন থেকে এবং তা পরবর্তীতে বিকশিত হয়েছে। জৈন, বৌদ্ধ এবং ব্যাহ্মণ সহ সকল ধারার শিল্প ভাব নির্ভর। .....তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও 'আধ্যাত্মিকতা' ভারতের ধর্ম ও শিল্পের সামান্য লক্ষণ বলা চলে। (Havell, 1920: 48)

সে কারণে শ্যামচরণের মতে, প্রাচীন ভারতীয় শিল্প – যা সময়ের সাথে সাথে অবনতির দিকে গেছে, গান্ধারের শিল্পের বিকৃত রূপ কালিঘাটের পটচিত্রে; সংস্কৃত সাহিত্যের বিকৃত রূপ পুঁথি এবং সংস্কৃত নাটকের বিকৃত রূপ যাত্রা হিসেবে ধরা পড়েছে। অবনীন্দ্রনাথের কাছে পুনঃর্জাগরণের ভিত্তি সেই বটতলা বা কালিঘাটের পটচিত্র বা রাজপুত বা মুঘল চিত্রকলা।

এখানে উল্লেখ্য, পাশ্চাত্যের জ্ঞানকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের আবর্তন। তিনি পাশ্চাত্যের আর্য-অনার্য তত্ত্বে যেমন বিশ্বাস করতেন, ঠিক তেমনি তার চিন্তায় পাশ্চাত্য বিবর্তনের ধারণার প্রভাব ছিল।

> জীবতত্ত্ববিদ যাঁরা, তাঁরা মানুষের জাতি বিভাগ করেছেন মুখাকৃতি ও দৈহিক মাপজোখ দিয়ে। তাঁরা কাউকে বলেছেন আর্য, কাউকে অনার্য, সেদিক থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, আর্যজাতি এসে ভারতবর্ষে অনার্যদের মধ্যে বসতি করলেন এবং অনার্যদের ক্রমে সকল দিক দিয়ে জয় করে আর্যবর্ত বলে প্রকাণ্ড একটা রাজত্ব স্থাপন করলেন। এ ঘটনার অনুরূপ ঘটনা আজও ঘটেছে। দেখব আজকের মিশনারীরা একইভাবে আফ্রিকা, ফিজি প্রভৃতি জায়গায় ধর্মবল এবং বাহুবল নিয়ে ক্রিয়া করে চলেছে অকর্মা ও অন্যকর্মাদের মধ্যে। শুধু এই নয়, অপেক্ষাকৃত সুসভ্য কিন্তু অন্যব্রত অথচ একই আর্যজাতি তাদের মধ্যেও পশ্চিমের আর্য সভ্যতার দূত সমস্ত নানাভাবে নানান ক্রিয়া করে চলেছে আজকের ভারতবর্ষে।

> এছাড়া আকৃতির হিসেবে দেখছি আর্য ছাঁচের মানুষ, কিন্তু বৃত্তির হিসেবে দেখছি রাক্ষস বা দস্যু এবং বুদ্ধির হিসেবে একেবারে বর্বর। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পৃথিবীজোড়া আর্যদের মধ্যে আজও ছড়ানো দেখতে পাই। সুতরাং যদি বলি ভারতের মধ্যে একটা জাতি আর্যব্রত, অন্যব্রত এবং অকর্মা-এই তিন থাকে বিভক্ত ছিল ভারত শিল্পের উৎকর্ষের শৈশবাবস্থায়, তবে একেবারে যে অসঙ্গত কল্পনা করা হল তা নয়। (ঠাকুর, ২০০৫: ২৩২)

অবনীন্দ্রনাথ, শ্যামচরণের মতো মনে করতেন হিন্দু এবং আর্য সমার্থক। একই সাথে অন্যব্রত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন কেবল খ্রীস্টান এবং হিন্দু আর্য হলেও তারা অন্যব্রত (উদ্ধৃত ঠাকুর, ২০০৫: ৩২১)। এই লেখায় তিনি এখানকার আদিবাসীদের অন্যব্রত বলে চিহ্নিত করেছেন, যারা পাশ্চাত্য ভদ্রলোক হওয়ার শর্ত পূরণ করে না। যারা এই সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠী, তিনি তাদের অকর্মা বলে চিহ্নিত করেছেন। তাই তাঁর বয়ানে এই এলাকার মেহনতি মানুষকে তিনি অকর্মা বলেছেন। একই বয়ান পাশ্চাত্য উপস্থাপন করেছে উপনিবেশিতের প্রসঙ্গে।

অবনীন্দ্রনাথ নিজেও শিল্পী ছিলেন। হ্যাবেল এবং কুমারস্বামীর মত শুধু তাত্ত্বিক ছিলেন না। অবনীন্দ্রনাথের 'ভারত মাতা' (১৯০৬) বিখ্যাত একটি ছবি। যা পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়। 'ভারত মাতা'য় তিনি লক্ষ্মীর চার হাতে শিল্প, সাহিত্য, সম্পদ এবং জ্ঞানের প্রতীক উপস্থাপন করেছেন। এই ছবিতে একাধারে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া রয়েছে। ঠিক তেমনি কলকাতার সমাজে সক্রিয় পাশ্চাত্যের সৌন্দর্য্য ধারণার বলয়কে ছেদ করার আকাঙ্ক্ষাও স্পষ্ট। তাই, ভারত মাতাকে উপস্থাপন করেছেন করুণাময়ী-রক্ষণশীল এক নারী রূপে। কলকাতার সমাজের আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, রুচির যে বিকৃতি ঘটেছিল তা থেকে বের হতে চেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। কলকাতার সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে যেমন পরিবর্তন ঘটেছিল, একান্নবর্তী পরিবার গঠন হওয়ার কারণে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গভীরতা বেড়েছিল, বেড়েছিল নির্ভরশীলতাও। স্ত্রীর কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র সাংসারিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে না থেকে সামাজিক কলেবরে তার প্রভাব ঘটেছিল পার্টি এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে যাতায়াতের মধ্য দিয়ে। তাই প্রত্যাশিত স্ত্রী 'মেমসাহেব'। তরুণ প্রজন্মের কামনা 'মেমসাহেব'। অবনীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তিত রুচির পরিবর্তন করার জন্য লক্ষ্মীর রূপ দিয়েছেন মমতাময়ী, নমনীয়, রক্ষাকারী এক আধ্যাত্মিক রূপে।

অবনীন্দ্রনাথ যে রূপ উপস্থাপন করেন তা আমাদের সভ্যতার মূল ভিত্তি নয়। এই সভ্যতার ভিত্তি গ্রামের প্রান্তিক নর-নারীর উৎপাদনমুখর জীবন – যা সুলতানের আলোচ্য বিষয়। অবনীন্দ্রনাথের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব প্রাচ্যবাদ, আর্য-অনার্য তত্ত্ব এবং বিবর্তনবাদের নির্ভর একটি বয়ান যা আমাদের আত্মসত্তার মুল ভিত্তি নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

৫ ঢাকার শিল্পচর্চার প্রবণতা

জয়নুল আবেদিন, সুলতান, কামরুল হাসান ঢাকাকেন্দ্রিক শিল্পচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ এবং অগ্রজ। ঢাকায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চা ১৯৪৮ সালে ঢাকা চারুকলা প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে। জয়নুল এবং কামরুলসহ আরো অনেকেরই চারুকলা প্রতিষ্ঠা ও চর্চায় মূখ্য ভূমিকা রয়েছে। তারা সকলেই শিল্পকলার পাঠ নেন কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজে। সে সময় কলকাতায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন যেমন চলছে, তেমনি আধুনিকতা এবং পুনর্জাগরণবাদের দ্বন্দ্ব চরম অবস্থায়। এ অবস্থার মধ্য দিয়েই তাঁদের শিল্পচৈতন্য নির্মিত হয়। ছাত্র জীবনে তাদের কাজের বিষয়বস্তু শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল না বরং ছিল শহর এবং শহরের বাহিরে থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং গ্রামীণ নৈসর্গ। বিষয়বস্তু চয়নে পুনর্জাগরণবাদের প্রভাব ছিল, কিন্তু উপস্থাপনা এবং অঙ্কনরীতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব ছিল বেশি। কিন্তু ১৯৪৭ এর পর থেকে প্রতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিউপনিবেশায়ন তৎপরতা কমতে থাকে। তার তিনটি কারণ ছিল – (১) মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রভাব, (২) মার্কসীয় রাজনীতির প্রভাব এবং (৩) ঢাকার শিল্পীদের বিদেশ গমন।

৫.১ মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রভাব

১৯৪৭-এর পর আধুনিকতা এবং পুনর্জাগরণবাদের দ্বন্দ্ব ঢাকায় এক নতুন মাত্রা পায় – পাকিস্তান রাষ্ট্রের পৃথক অভিব্যক্তি খোঁজের আকাঙ্ক্ষায়। তখন বাঙালি মুসলমানের ধর্ম, আত্মপরিচয়ের এবং জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গের নতুন করে মীমাংসার প্রয়োজন হয়। ফলে বাঙালী মুসলমানের আত্মপরিচয়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পাকিস্তান আমলে সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ালো। তার বাইরে শিল্পচর্চা নয়। এই আত্মপরিচয়ের সংকটের কারণে বাঙালি মুসলমান শিল্পী কখনো অনুপ্রেরণা খুঁজেছে নিজেদের ইতিহাসের মধ্যে, কখনো আবার খুঁজেছে ভারতবর্ষের বাইরে মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিমে। বিশেষত, পশ্চিম আমাদের শিল্প আন্দোলনকে পুনরায় গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং প্রতিরোধের আকাঙ্খাও কমে আসে। তা উঠে আসে জয়নুলের লেখা থেকে-

> আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি অনেক পুরানো। বহু শতাব্দীর প্রাচীন এ সংস্কৃতি এবং আমাদের সংস্কৃতিকে যথার্থ অর্থে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য প্রয়োজন নিজের দেশ ও মাটির সত্যিকার চেতনার সাথে একাত্ম হওয়া। এ জন্য আমরা পৃথিবীর সবকিছু ভালো গ্রহণ করবো। কিন্তু এই গ্রহণ করা কোনভাবেই অজ্ঞান হয় নয়। বরং নিজের সত্যকে জেনেই আমরা গ্রহণ

> করবো। নিজের পরিবেশকে মেনে নিয়েই আহরণ করবো আমাদের এই পরম সঞ্চয়। তা যদি না করি তাহলে আমরা হারিয়ে যাবো, হারিয়ে যাবো কৃত্রিম এক জীবনের অতল অন্ধকারে। (উদ্ধৃত হয়েছে – তাহের, ২০০৮ : ৫১)

শ্যামচরণের প্রায় একশত বছর পর উপনিবেশোত্তর পর্বে জয়নুল এবং অরবিন্দ-এর ভাবনার মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্যামচরণ এবং অরবিন্দর ভাবনা বৃটিশ শাসনকালের। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয়, ধর্ম, আধুনিকতা এবং প্রগতি প্রশ্ন পূর্ব পাকিস্তানে যে সুরাহা হয়নি তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তখন পাশ্চাত্য থেকে বেঙ্গল স্কুলের সাথে বিচ্ছেদ করার প্রবণতা প্রবল হয়। (তাহের, ২০০৮: ২৫; ইসলাম, ২০০৩: ২৯, ৩৩)

৫.২ মার্কসীয় রাজনীতির প্রভাব

সে সময় বেঙ্গল স্কুলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটানোর একমাত্র কারণ সদ্য জন্ম হওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের মুসলমান জাতীয়তাবাদ নয়; বরং মার্কসীয় রাজনীতিও একটি কারণ। মার্কসীয় দর্শন পুনজাগরণবাদ এবং প্রাচ্যবাদের দার্শনিক ভিত্তিকে গুরুত্ব খানিকটা দুর্বল করে দেয়। ফলে পাশ্চাত্যকে প্রতিরোধের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে । পঞ্চাশের দশকে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'ঢাকা আর্ট স্কুল'। যেখানে শিল্পীদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন মার্কসীয় বুদ্ধিজীবীরা; তাদের মধ্যে অন্যতম সরদার ফজলুল করিম, অজিত কুমার গুহ, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ (তাহের, ২০০৮: ২৪; ইসলাম, ২০০৩: ২০)। ঢাকা আর্ট গ্রুপের মার্কসীয় চিন্তকদের সাথে ভাবনার আদান-প্রদানের কারণে পূর্ব-পশ্চিমের পৃথকীকরণে আগ্রহ কমতে থাকে। তাছাড়া মার্কসীয় দর্শনে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বিরোধ কোন মৌলিক বিরোধ বলে মনে না করার কারণে বেঙ্গল স্কুলের বুদ্ধিভিত্তিক ভিত্তি খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া, হ্যাবেল এবং অবনীন্দ্রনাথের কাছে ভাবনির্ভর ভারতীয় শিল্পকলার উপজীব্য আধ্যাত্মিকতা এবং অধিবিদ্যা। যা মার্কসীয় দৃষ্টিতে খারিজযোগ্য। বস্তুবাদী দর্শনের দৃষ্টিতে যথার্থ শিল্পতত্ত্ব বাস্তববাদ, যা ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিগত একশত বছর ধরে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে, পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর অঙ্কনরীতির কদর এবং সমাদর বাড়তে থাকে ঢাকায়। জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবি তারই উদাহরণ। তাই জয়নুল দ্বিধাহীনভাবে বলেন, 'রেনাসাঁর পর থেকে ইউরোপীয় যত শিল্প আন্দোলন ঘটেছে সব হয়েছে সজ্ঞানে এবং সেটা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি চাই আমাদের শিল্পীরা নিজের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিল রেখে যেন কাজ করে। বিদেশি আঙ্গিকের গ্রহণ দোষণীয় নয়।' (তাহের, ২০০৮: ৫১)

৫.৩ ঢাকার শিল্পীদের বিদেশ গমন

১৯৫৮ সালের পর থেকে ঢাকার অনেক শিল্পী বৃত্তির টাকায় পড়তে যান ইউরোপে এবং জাপানে। তাদের মধ্যে হামিদুর রহমান শিক্ষা লাভ করেন লন্ডনে, রশীদ চৌধুরী স্পেন

ও ফ্রান্সে, আমিনুল ইসলাম ও মর্তুজা বশীর ইতালি, আব্দুর রাজ্জাক ও আব্দুল বাসেত আমেরিকায়, মোহাম্মদ কিবরিয়া জাপান এবং সফিউদ্দিন আহমেদ লন্ডনে শিক্ষা লাভ করেন (তাহের, ২০০৮: ২৬)। সে সময় ঢাকার শিল্পীরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পাশ্চাত্যের শিল্প আন্দোলনের সাথে পরিচিতি হন এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসে। আঙ্গিকগত দিক থেকে অনুকরণের প্রবণতার শুরু হয়। তখন ইমপ্রেসিনিজম, এক্সপ্রেসিনিজম, স্যুরিয়েলিজম, বিমূর্তবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন ধারাচর্চা লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে মোহাম্মদ কিবরিয়া বলেন, 'উন্নত দেশগুলোতে যেসব শিল্পী শিক্ষা গ্রহণ করতে যায় এবং ছাত্র হিসেবে তারা যে শিক্ষা নিয়ে আসে তাতে শুধু শিল্প চর্চাই নয়, স্থাপত্য, জীবনযাত্রার প্রতি ক্ষেত্রে নতুন শিক্ষা নিয়ে আসে। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার থেকে শিল্পী বিচ্ছিন্ন নয়। শিল্পীর যা ভালো লাগে তা সেখান থেকে নেয়। এটা দোষের কিছু নয়। এই ষাটের দশকের শিল্পচর্চা ও শিক্ষাদানের ভাল দিক হচ্ছে পাশ্চাত্য শিল্পের কলাকৌশল এবং দেশের কি ভালো দিক আছে তা বোঝা সম্ভব হয়েছে।' (তাহের, ২০০৮: ২৭)। আবু তাহের ঢাকার শিল্প ধারা আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন, 'আসলে আমাদের লোকচর্চায় অন্তর্নিহিত বিষয়টাকে দু-একজন ব্যতিরেকে অনেকেই ভালোভাবে উপলব্ধি করে ব্যবহার করতে পারেনি। আবার পাশাপাশি কয়েকজন চিত্রশিল্পীর কিছু কিছু কাজে এতো বেশি পাশ্চাত্য ঢঙ ও রীতির প্রয়োগ ঘটেছে তাতে করে জাতিগত পরিচয়ের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে' (তাহের, ২০০৮: ২৭)।

এক কথায় বলা চলে, মূল ধারা আঙ্গিকগত দিক থেকে আধুনিকতার নামে সম্পূর্ণ অর্থে পাশ্চাত্য দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। ঢাকা আর্ট গ্রুপ-এর প্রারম্ভে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ এবং মুসলমানের আত্মপরিচয়ে সংকটের মধ্যে থাকায় বাঙালী জীবনের বয়ান অনুপস্থিত ছিল। পরবর্তীতে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের পর থেকে ২১ ফেব্রুয়ারীকে কেন্দ্র করে পোস্টার, আলপনা আঁকা ছিল বাঙালি সংস্কৃতির একমাত্র প্রকাশ। কিন্তু বিষয়বস্তুগত দিক থেকে স্বকীয়তা প্রকাশিত হয় মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে।

সুলতানের ভাবনা, অঙ্কনরীতি এবং বিষয়বস্তু চয়নের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা ছিল। এদেশে সুলতান ইউরোপীয় শিল্পচর্চার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও সন্দিহান ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিদেশিদের কাছ থেকে আমরা কত সাহায্য পাচ্ছি সেটা বড় কথা নয়; আমাদের দেশের মানুষের মানসিক উন্নতি ঘটেনি। নান্দনিক জ্ঞানের উন্নতি হয়নি, হয়েছে অবক্ষয়।' এ থেকে সুলতানের বিউপনিবেশায়ন এবং শিল্পভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৬. সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা

৬.১ বিষয়বস্তু

সুলতানের চিন্তার ক্ষেত্রভূমি ঢাকার শিল্পচর্চা, কলকাতার পুনর্জাগরণবাদ এবং ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পকলা। তার ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতা আর্ট কলেজে। তিনি পঞ্চাশের দশকে দেশে ফেরার আগে কিছুকাল আমেরিকায় এবং লন্ডনে ছিলেন। সে সময় ইউরোপীয় ইমপ্রেসনিস্ট ধাঁচে আঁকা ছবিগুলো পিকাসো, দালিদের সাথে প্রদর্শিত হয়েছে। যা থেকে ধারণা করা যায়, তিনি পাশ্চাত্য অঙ্কনরীতিসিদ্ধ হয়েছিলেন। সর্বোপরি পঞ্চাশের দশকের পর থেকে বাংলাদেশে থাকার কারণে বাংলাদেশের শিল্পচর্চার আত্মপরিচয়ের সংকটের বিষয়ে অবগত ছিলেন। সে কারণে সুলতানের ভাবনার ক্ষেত্র সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের আত্মপরিচয়, আধুনিকতা এবং প্রগতির মধ্যে আটকে পড়া ঢাকার শিল্পচর্চার সংকট এবং বৈশ্বিকতার নামে হাজির পাশ্চাত্য শিল্পকলা। এই সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়েই বাংলাদেশে তার শিল্পকলার বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাব দিয়েছেন; যা পরিণত বয়সের সুলতানের শিল্পচৈতন্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। যার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বিষয়বস্তু, অঙ্কনরীতি এবং উপকরণ ব্যবহারে। নৃতাত্ত্বিক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর মনে করেন, সুলতানের বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাবের অনেকাংশ পুনরাবৃত্তিমূলক, বিশেষ করে 'চিত্রগত সমস্যার ক্ষেত্রে তার সমাধান পুনরাবৃত্তিমূলক, সে জন্য তাকে মনে হয় গ্রাম্য সরল' (জাহাঙ্গীর, ১৯৯৫: ২৩)। তার বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাব বঙ্গীয় পুনর্জাগরণবাদ থেকে স্বতন্ত্র এবং তিনি অঙ্কনরীতির ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা নিয়েছেন প্রাক-ঔপনিবেশিক শিল্পরীতি থেকে। কিন্তু তিনি প্রাক-ঔপনিবেশিক চিত্ররীতিতে ফিরে যাননি, তার সৃষ্টিশীল বৈশ্বিক রূপান্তর ঘটিয়েছেন কিন্তু তা প্রাক-ঔপনিবেশিক চিত্ররীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। একই সাথে বিষয়বস্তু ঔপনিবেশিক জ্ঞানভাণ্ডারে একটি প্রতিবয়ান, প্রান্তের জীবনশক্তি এবং বাংলাদেশের হাজার বছর টিকে থাকার ভিত্তির অনুসন্ধান।

৬.১১ কেন্দ্র এবং প্রান্ত

আধুনিক শিল্পীদের বিষয়বস্তু প্রায়শই শহুরে জনগোষ্ঠী। শহুরে মানুষের যান্ত্রিক জীবনের জটিলতা, একাকিত্ব এবং বিচ্ছিন্নতা। দীর্ঘ সারি সারি দালানে থাকা মানুষগুলোর দৃষ্টি জানালা দিয়ে বেশি দূর প্রসারিত হতে পারে না, দালানের জন্য। তাই তাদের অভিজ্ঞতা, একাকিত্ব এবং বিচ্ছিন্নতা হয়ে উঠেছে বিমূর্তবাদী, স্যুররিয়েলিস্ট এবং কিউবিস্ট শিল্পীদের বিষয়বস্তু। কিন্তু চারদশক আগে ঢাকার বাস্তবতা এমন ছিল না। তখন দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করার মত দীর্ঘ সারিসারি দালান ছিল না। পুঁজির চাপে ঢাকার মানুষের নিরন্তন ছুটে চলার জীবন ছিল না। সর্বোপরি, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আশানুরূপ উন্নতি না হলেও প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপের মানুষের মত হতাশা এবং বিষন্নতা ছিল না। অথচ কখনো কখনো বাংলাদেশের শিল্পী পাশ্চাত্যের

অঙ্কনরীতির সাথে সাথে বিষয়বস্তুও নিয়ে এসেছেন। যা ঢাকার নাগরিক জীবনের সত্যভ্রম নির্মাণ করেছে।

অন্যদিকে ঢাকার যে কিছু শিল্পীর বিষয়বস্তু বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন ও নৈসর্গ তা ঔপনিবেশিক উপস্থাপনা থেকে ভিন্ন নয়। ঔপনিবেশিকদের মতো তাদের ছবিতেও গ্রামীণ জীবন ধরা পড়েছে নৈসর্গের অংশ– 'বিচ্ছিন্ন কোন অপর' রূপে। এই লোকজ সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি খুজতে ব্যর্থ হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে শহুরে মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক সংকট চিহ্নিত করতে বাধা সৃষ্টি করেছে। যে কারণে আমরা দেখতে পাই স্বাধীনতা-উত্তর অধিকাংশ চিত্রে এদেশের সমাজ-ইতিহাস দর্শনের অভাব রয়েছে। ফলে, বাংলাদেশের নন্দন ভাবনা হয়ে পড়েছে বিজাতীয় এবং লোকজ সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। আধুনিকতা এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক শিল্পে নাগরিক জীবনের সংকট এবং আত্মসমালোচনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার কারণ ব্যাখ্যা করে ক্যামেরোন ম্যাক্যার্থি এবং গ্রেগ দিমিত্রিয়াদিস বলেন, 'আধুনিক শিল্পের বিষয়বস্তু মহানগরের কেন্দ্রের পুঁজিবাদী সংস্কৃতি এবং তার তরঙ্গিত বয়ান। সেকারণে আধুনিক শিল্পচর্চাকে টিকে থাকতে হয় মধ্যস্থতা এবং কতগুলো ছকের মধ্যদিয়ে। এই আপোসকারী চরিত্রের জন্য আধুনিক শিল্প সমালোচনা এবং পথ নির্দেশনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে' (Mccarthy and Dimitriadis, 2000: 231)।

ম্যাক্যার্থি এবং দিমিত্রিয়াদিস এর আধুনিক শিল্পের প্রবণতাবিষয়ক বিশ্লেষণ আমাদের বুঝতে সহায়তা করে– কেন সুলতানের বিষয়বস্তু গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। উপনিবেশিত রাষ্ট্রগুলোর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সবসময় ইউরোপীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, কলকাতার মধ্যবিত্তের জীবনযাপন ভাবনা, চিন্তা এবং রুচি নির্মাণে পাশ্চাত্যে প্রভাব প্রসঙ্গে। ঢাকার বাস্তবতার মাত্রাগত পার্থক্য থাকলেও ঢাকার প্রভাবশালী সংস্কৃতিতে তার সত্যতা রয়েছে। যে কারণে সুলতান গ্রামীণ মানুষের কর্মময় জীবন বেছে নিয়েছেন। তিনি গ্রামীণ মানুষকে শুধুমাত্র উৎপাদনের ভিত্তিই মনে করেননি। একই সাথে মনে করেছেন বিউপনিবেশিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভিত্তিও। তার এই ভাবনায় ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের সারসত্তাবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি উৎপাদন ও জীবনযাপনের এমন অংশকে উপস্থাপন করেছেন যা কালান্তরে অপরিবর্তনশীল এবং ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির কোন বিকৃতি ঘটাতে পারেনি। এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে, সুলতানের চিত্রকলা ভাব নির্ভর; যা হ্যাবেল, কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেই ভাব আধ্যাত্মিকতা নয়। হাজার বছরের শোষণ, শাসন এবং বিজাতিদের লুটের পরে টিকে থাকার ক্ষমতা। গ্রামীণ জীবনের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তাদের কর্মময় জীবন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সুলতান মনে করতেন প্রাচ্যবাদী এবং বঙ্গীয় পুনর্জাগরণবাদীরা এই অঞ্চলের ভুল আত্মসত্তা চিহ্নিত করেছেন।

বাংলাদেশের শিল্পকলা থেকে প্রকাশিত এস. এম. সুলতান স্মারক গ্রন্থের ভূমিকায় সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং সুবীর চৌধুরী (১৯৯৫) সুলতানের ছবিকে 'নিম্নবর্গীর স্বপ্ন' বা Subaltern vision চিহ্নিত করেন। মনজুরুল এবং সুবীর নিম্নবর্গের

স্বপ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেননি। কিন্তু শাব্দিক অর্থ দেখে আমরা অনুমান করতে পারি শহুরে শ্রমিক শ্রেণি বা গ্রামের কৃষক নিম্নবর্গের একটি উদাহরণ। তাদের জীবনের স্বপ্নই হচ্ছে নিম্নবর্গীয় স্বপ্ন। সুলতানের বিষয়বস্তু কৃষক হওয়ার প্রেক্ষিতে অনুমেয় কৃষকের স্বপ্নই মনজুরুল এবং সুবীর ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু সুলতানের বিষয়বস্তু কৃষকের স্বপ্ন নয়। তা হলো হাজার বছরের বাংলাদেশের কৃষকের কর্মময় জীবন, প্রকৃতির প্রতিকূলতার সাথে টিকে থাকার লড়াইসহ গ্রামের প্রান্তিক কৃষকের জীবনের মহা বয়ান। যা সুলতানের কাছে পরম সত্য/বাস্তবতা বলে ধরা পড়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ইতিহাস বিশেষজ্ঞ পার্থ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৪), রণজিৎ গুহ (২০০১, ২০১০) ও গৌতম ভদ্র (১৯৯৪) মনে করেন, কৃষকের সচেতন রাজনৈতিক চৈতন্য রয়েছে এবং তারা সমাজ পরিবর্তনে বিপ্লব করতে সক্ষম। কিন্তু সুলতানের চিত্রকলার স্থান, কাল, ব্যক্তি নির্বিশেষে যে বাস্তবতার বয়ান আছে তা হচ্ছে প্রকৃতি, শোষণ ও বঞ্চনার মধ্যে টিকে থাকার মানসিক শক্তি। বৃহৎ কোন রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কোন ইঙ্গিত নেই। এখানেই হয়তো সুলতানের সাথে পার্থ ও রণজিৎ এবং গৌতমের চৈতন্য পাঠের ভিন্নতা। এজন্য বলা যেতে পারে, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং সুবীর চৌধুরী যে অর্থে নিম্নবর্গীয় স্বপ্নের কথা বলে থাকেন না কেন তার কোন ইঙ্গিত সুলতানের শিল্পকর্মে নেই। সুলতান মনে করতেন বাংলাদেশের কৃষকরা যুদ্ধ করেছেন, তাদের প্রত্যাশা ভেঙেছে কিন্তু তা কোন রাজনৈতিক অভীক্ষা নয়। তিনি শাহাদুজ্জামানকে দেয়া এক সাক্ষাতৎকারে বলেন, "অনেক আশা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু They were betrayed। এই যে একটি exploration process, আমার ছবিগুলো তার প্রতি চ্যালেঞ্জ।" (শাহাদুজ্জামান, ১৯৯৪: ১৪)

৬.১২ আত্মপরিচয়ের প্রতিবয়ান

যে কোন বিউপনিবেশায়ন তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে আত্মপরিচয়। সুলতান সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন এবং তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে তার শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুতে। একই সাথে তিনি ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে উপনিবেশিত উপস্থাপনার রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তার শিল্পকর্মে সেই বয়ানের প্রতিবয়ান রয়েছে। এই উপস্থাপনের রাজনীতি নিয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকগণ বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ বিষয়ে ইয়ং বলেন–

> ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদ বৈধতার জন্য নির্ভর করে সেই সব নৃতাত্ত্বিক তত্ত্বের উপর যেখানে উপনিবেশিতকে উপস্থাপন করা হয় দূর্বল-শিশুসুলভ-নারীরূপে, যাদের নিজেদের দায়িত্ব নেয়ার ক্ষমতা নেই এবং তাদের ভালোর জন্য পিতৃসুলভ পশ্চিমা শাসন প্রয়োজন। (Young, 2003: 3)

সুলতানের প্রতিবয়ান পাশ্চাত্যের ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবে বৈধতা প্রদানকারী জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু সুলতান পাশ্চাত্যের সর্বগ্রাসী বয়ানের বিপক্ষে যে প্রতিবয়ান দাঁড় করান তা বেঙ্গল স্কুলের আধ্যাত্মবাদ থেকে ভিন্ন। ভারতে ভাবনাজগৎ আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ নয়। আমাদের চিন্তার ইতিহাসে যেমন বস্তুবাদের স্পষ্ট

উদাহরণ পাওয়া যায় ঠিক তেমনি যুক্তিনির্ভর দর্শন চর্চারও সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তার উদাহরণ হচ্ছে ন্যায়সূত্র, কথাবাথু, হেতুবিন্দুর মত গ্রন্থসমূহ। এ থেকে অনুমেয় ভারতের মূলধারার চিন্তা আধ্যাত্মিক নয়; বরং যুক্তিনির্ভর। তবে সেই যুক্তি পাশ্চাত্যের আদলের নয় (বিস্তারিত– নিজার, ২০১২)। আমাদের আধ্যাত্মবাদী আত্মপরিচয় নির্মাণ করতে গিয়ে আমাদের ভাবনা জগৎ, সংস্কৃতি, শিল্পকলার একটি বড় অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে নতুবা বিকৃত কিংবা বিকৃতভাবে আংশিক উপস্থাপন করা হয়েছে। এই আত্মপরিচয় যেমন গ্রামের লৌকিক সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন অন্যদিকে শহুরে মধ্যবিত্তের জাগতিক সমস্যার সমাধান করতেও ব্যর্থ। তারই পরিণতি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের জন্ম (ভারত ও পাকিস্তান)।

পাশ্চাত্য আমাদের দুর্বল, অলস, কর্মবিমুখ, নারীসুলভ জাতিগোষ্ঠী হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তারা প্রতিষ্ঠা করেছে আমার আমাদের নিজেদের রক্ষা এবং শাসন করার ক্ষমতা নেই। যা ঔপনিবেশিক শাসনের নৈতিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে। তখন পুনজাগরণবাদীগণ জাতীয় পরিচয়ের অনুসন্ধান করেন আধ্যাত্মিক নারীর মধ্যে। যে নারী "মেমসাহেব" নয়, কিন্তু তিনি সক্ষমও নন। তিনি কোমল এবং প্রতিকূলতায় আত্মরক্ষা করে চলেছেন। সেখানে সুলতানের কৃষাণ-কৃষাণী পেশীবহুল এ পেশীর মধ্যে তিনি প্রকাশ করেন তাদের হাজার বছর ধরে টিকে থাকার মনোবল। এ পেশী নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। এখানেই ধরা হয় সুলতানের কৃষাণ-কৃষাণীর জীবনের মূল চেতনা। তাই, সুলতানের শিল্পকর্ম ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের উপস্থাপিত প্রান্তিক কৃষকের জীবনের একটি প্রতিবয়ান।

৬.১৩ আত্মসত্তার বি-বিচ্ছেদায়ন প্রস্তাব

বেঙ্গল স্কুলের আধ্যাত্মবাদ নির্ভর আত্মপরিচয় নির্মাণকে দ্বি-বিচ্ছেদায়ন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিচ্ছেদায়ন নিয়ে হেগেল এবং মার্কস বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু, আমাদের বর্তমান আলোচনা মার্কসীয় বিচ্ছেদায়ন ধারণা নির্ভর। মার্কস তাঁর *Economic and Philosophycal Manuscripts of 1844* গ্রন্থে উৎপাদন, শ্রম এবং উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে চার ধরনের বিচ্ছেদায়ন চিহ্নিত করেন– (১) উৎপাদিত পণ্য থেকে শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতাবোধ, (২) উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ, (৩) আত্মসত্তা থেকে শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং (৪) একে অপর থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ (Tucker, 1975)। সমকালীন সমাজতাত্ত্বিক আত্মসত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধকেই বিচ্ছেদায়ন বলে চিহ্নিত করেছেন এবং সেই আত্মসত্তায় ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আবার যখন নতুন আত্মসত্তা নির্মাণ করা হয় তখন দ্বি- বিচ্ছেদায়ন ঘটে (বিস্তারিত, Bowers, 2004)।

প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে উৎপাদনব্যবস্থা কৃষিনির্ভর। সেখানে উৎপাদক এবং উৎপাদনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতে বৃহৎ কলকারখানা, রাবার বাগান বা চা বাগান করা শুরু হয়। তখন থেকে উৎপাদক এবং উৎপাদনের সম্পর্ক পরিবর্তন হতে থাকে। সে সময় শ্রমিকের যোগান দিত এক শ্রেণির দালাল। বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাদের নিয়ে আসা হতো । ফলে তাদের জন্মস্থান থেকে

বিচ্যুতি ঘটে একই সাথে নতুন পেশা তাদের জীবন-যাপন, জীবনযাপন, আত্মসম্পর্ক, ভাবনাগুলো নতুন করে নির্মাণ করেছে। ফলশ্রুতিতে নির্মাণ হয়েছে নতুন সত্তা যা পূর্ব থেকে ভিন্ন। এ প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করা হয় 'আত্মসত্তার বিচ্ছেদায়ন' হিসেবে।

কিন্তু এই বিচ্ছেদায়ন পুনরায় সংঘটিত হয়, যখন বিউপনিবেশায়নের প্রত্যয় নিয়ে আমরা পাশ্চাত্য উপনিবেশায়নের প্রতিরোধের ভাষা খুঁজি 'প্রাচ্যবাদী' জ্ঞানকাণ্ডে। প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাক-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির একটি বিশেষ অংশের উপর ভিত্তি করে আত্মপরিচয় নির্মাণ করে। এই নির্মিত আত্মপরিচয় হচ্ছে 'আধ্যাত্মিকতা'। তা পুনরায় আত্মসত্তার বিচ্ছেদ ঘটায়, অর্থাৎ আত্মসত্তার দ্বি-বিচ্ছেদায়ন হয়।

সুলতান 'আত্মসত্তার দ্বি-বিচ্ছেদায়ন' প্রসঙ্গের সাথে পরিচিত ছিলেন না কিন্তু তা উপলব্ধি করতে পারতেন। সুলতান দ্বি–বিচ্ছেদায়ন থেকে বের হতে চেয়েছেন। তার এই প্রবণতাকে বি-বিচ্ছেদায়ন বলা যেতে পারে। তা মার্কসীয় বি-বিচ্ছেদায়ন প্রস্তাব থেকে ভিন্ন। মার্কস ভেবেছেন উৎপাদন যখন সৃষ্টিশীল হবে এবং লগ্নি ও উৎপাদনের অংশীদার শ্রমিক শ্রেণির হবে তখন বি-বিচ্ছেদায়ন ঘটবে। কিন্তু সুলতানের ভাবনা ভিন্ন এবং অপরিপক্ব। তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যবাদের থেকে বি-বিচ্ছেদায়ন প্রক্রিয়ার ভিত্তি মনে করেছেন হাজার বছরের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সেই উৎপাদন ব্যবস্থাকেন্দ্রিক কৃষকের সংস্কৃতিকে। সেই কারণে বলা যেতে পারে সুলতানের ছবি ঔপনিবেশিক কালে এবং তার উত্তর পর্বে আমাদের সংস্কৃতি এবং উৎপাদন ব্যবস্থা যে বিচ্ছেদায়নে মধ্য দিয়ে গেছে তা থেকে বি-বিচ্ছেদায়নের একটি প্রস্তাব।

সুলতান ওয়াকিবহাল যে হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠী দ্বারা তারা নিপীড়িত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমার ছবিগুলো তার প্রতি একই চ্যালেঞ্জ। শোষণ কর, কোন মশা এদের খেয়ে শেষ করতে পারবে না। ব্রিটিশরা করেছে, পাকিস্তানীরা লুটপুটে খেয়েছে, এখনও চলছে কিন্তু ওরা অমিয় শক্তিধর। কৃষককে ওরা শেষ করতে পারবে না, আমার কৃষক এরকম।' [শাহাদুজ্জামান, ১৯৯৪: ১৫]
নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *An Approch to Indian Art* গ্রন্থে ভারতের চিত্রকলার গতিবিধি এবং প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ভারতের চিত্রকলার আধ্যাত্মিকতা এবং তত্ত্ববিদ্যা থেকে বের হয়ে আসা প্রয়োজন। তিনি মনে করেন চিত্রকলার তাত্ত্বিকভাবে আরো ইতিহাস, সমাজবিদ্যা এবং মানববিদ্যা অভিমুখী হওয়া উচিত। একই ধরনের আভাস পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথের শেষের দিকে লেখায়-

> ঝুপ করে ভারত শিল্পে আধ্যাত্মিক অংশ ছোঁ দিয়ে তুলে ফেললেন, এতে ভয় আছে, বাধাও আছে– ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার বাধাও নেই, ভয়ও নেই। অবশ্য এভাবে চললে ভারত শিল্পের মর্মে পৌছাতে সময় লাগবে, কিন্তু নারিকেলের শাঁস জলে পৌছাতেও একটু সময় লাগে (ঠাকুর, ২০১২(২) : ১৯৭)।

অবনীন্দ্রনাথের দ্বিধা খানিকটা হলেও নীহাররঞ্জন রায় উপলব্ধি করেছিল। সুলতানের কাজ তা বাস্তবতায় পরিণত করেছে। একই সাথে তিনি বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়নের মূল ভিত্তি লৌকিক সংস্কৃতির কার্মময় জীবন চিহ্নিত করেছেন। যা

একই সাথে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিবয়ান এবং আত্মসত্তার বি-বিচ্ছেদায়ন প্রস্তাব।

৬.১৪ অঙ্কনরীতি

সুলতান বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যেমন আত্মসত্তার অন্বেষণ করেছেন তেমনি অঙ্কনরীতির ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র বিউপনিবেশায়ন ভাবনার বহিপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি প্রাক-ঔপনিবেশিক অঙ্কনরীতি, সৃষ্টিশীল রূপান্তর ঘটিয়েছেন। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি অঙ্কনরীতি প্রসঙ্গে ঢাকার শিল্পীগণ গভীরভাবে পাশ্চাত্য অঙ্কনরীতি দ্বারা প্রভাবিত। অন্যদিকে, আঙ্গিকগত দিক থেকে তিনি কেবল দেশজ অঙ্কনরীতিতেই ফিরে যেতে চাননি, দেশজ অঙ্কনরীতির উন্নয়ন করেছেন। তিনি মনে করতেন, সমাজ এবং বাস্তবতার কারণে আমাদের পক্ষে অউপনিবেশিত অঙ্কনরীতিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়; এমনকি সম্ভব হলেও তার প্রয়োজন নেই। তার এই ভাবনা স্পষ্ট হয় যখন পটুয়া রেখা নিয়ে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে বলেন 'পৃথিবী অনেক দূর এগিয়ে গেছে, Science অনেক দূর এগিয়েছে, এখনতো বাঙ্গালির ঐ পটুয়া line-এ কাজ করলেই শুধু হবে না। পটুয়া line এর character-টা ধরে নতুন করে ভাবা যেতে পারে।' (শাহাদুজ্জামান, ১৯৯৪: ২৩)

কিন্তু, এই অঙ্কনরীতি বাংলাদেশের শিল্পবোদ্ধা ও রসিকদের কাছে ধরা পড়েছে 'অনাধুনিক' বা 'নাইভ' হিসাবে (জাহাঙ্গীর, ১৯৯৫; ইসলাম, ২০০৯)। আবার, কারো কারো কাছে ভারতীয় শিল্প ঐহিত্য বিচ্ছিন্নরূপে (ছফা, ১৯৯৫: ১০৫)। আহমেদ ছফা মনে করেন, 'হ্যাবেল ভারতীয় শিল্পাদর্শের যে ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন কেউ তার আওতা ছাড়িয়ে যেতে পারেননি- একমাত্র সুলতান ছাড়া' (ছফা, ১৯৯৫: ১০০)। ছফা আংশিক ভুল, সুলতানের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে হ্যাবেলীয় ভারতীয় শিল্পাদর্শের প্রভাব নেই কিন্তু অঙ্কনরীতির ক্ষেত্রে হ্যাবেলীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান। ভারতবর্ষের চিত্রকলা ভাবনির্ভর। পরিপ্রেক্ষিত সেখানে সব সময়ই গুরুত্বহীন। এ প্রসঙ্গে হ্যাবেল বলেন, 'Indian artistic anatomy is a possible and consistent ideal anatomy, and Indian perspective is a possible and consistent ideal perspective.' (Hevell. 1920: 122,123) । সুলতানের কাজেও পরিপ্রেক্ষিত অনেক বেশি অনুপস্থিত। তার অন্যতম কারণ, সুলতানের চিত্র ভাবনির্ভর। ভাব বস্তুর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব থাকায় পারিপার্শ্বিক গুরুত্বহীন হয়ে উঠেছে। তাই পরিপ্রেক্ষিতের উপর তিনি গুরুত্ব দেননি। অন্যদিকে, সুলতানের এই স্বাতন্ত্র্যতাও বাংলাদেশের অনেক শিল্প রসিকদের কাছে ধরা পড়েছে আধুনিক ব্যাকরণসিদ্ধতার অভাব হিসাবে।

সুলতানের ছবিতে পুরুষের ফিগার দৈত্যাকার এবং পেশিবহুল, কিন্তু নারীর ফিগার গোলাকৃতির এবং লাবণ্যময়। পুরুষের চেহারায় রয়েছে হাজার বছরের ক্লান্তির ছাপ। সুলতানের ছবিতে ফিগারগুলোর মধ্যে লৈঙ্গিক পার্থক্য ছাড়া আর তেমন কোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। যদিও পাশ্চাত্যে এবং আমাদের দেশের অনেক শিল্পীর কাজে এই ধরনের প্রবণতা দেখা গিয়েছে।

ম্যানচেস্টারের বিখ্যাত চিত্র শিল্পী লাউরির কাজে একই প্রবণতা রয়েছে। লাউরির ছবিতে উঠে এসেছে ম্যানচেস্টারের শিল্প বিপ্লবের সময়কার মানুষের জীবন। তার ছবিগুলোতে প্রাসপেক্টিভগত কারণে ফিগারগুলোর আকৃতিগত পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না। তার কারণ আঠারো শতকের শিল্প-বিপ্লবের সময় যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা হাজার হাজার শ্রমিকদের শুধু স্থানান্তরিতই করেনি, তাদের করেছে ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। সর্বোপরি অর্থনৈতিক সামাজিক বাস্তবতা এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে ব্যক্তি তার নিজস্বতা হারাতে বাধ্য। সুলতানের চিত্রে সম্ভবত একই কারণে কৃষক-কৃষাণীর চেহারা প্রায় পার্থক্যবিহীন।

সুলতান মনে করতেন ধর্ম ও শ্রেণিবিভাজন এ অঞ্চলের মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়। তিনি নিজেও ধর্ম বা শ্রেণী বৈষম্যে বিশ্বাস করতেন না। শেষ জীবনে তিনি তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন হিন্দু ছেলে-মেয়েসহ এক বিধবা নারীকে। এ সব কারণে সম্ভবত ধর্মভিত্তিক বর্ণভিত্তিক কোন পার্থক্য ফিগারগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় না। আমাদের উৎপাদন চক্রের মূল ভিত্তি যে বাঙালি কৃষক-কৃষাণী; সেই সত্য কোন ব্যক্তি কৃষক বা কৃষাণীনির্ভর নয়। তা এ অঞ্চলের এক সর্বজনীন বাস্তবতা। সেই দর্শনই ধরা পড়েছে সুলতানের চিত্রে।

তিনি কৃষকের জীবনের বিশালতা ধরতে গিয়ে কৃষকের মনুমেন্টাল আকার দিয়েছেন। এই বিশাল ফিগারগুলি দেখে অনেকে মনে করেছেন সুলতানের শিল্পকর্মে মাইকেল এঞ্জেলোর প্রভাব রয়েছে। মাইকেল এঞ্জেলো রেনেসাঁ কালের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের একজন। তিনি একাধারে ভাস্কর, স্থপতি ও চিত্রশিল্পী। মাইকেল এঞ্জেলো বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাগুলোর চিত্ররূপ প্রদান করেন বিভিন্ন চ্যাপেল ও চার্চের ছাদে। বাইবেলের চরিত্রগুলোর গুরুত্বের কারণে হোক আর উঁচু চ্যাপেলগুলির ছাদে অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখার আরামের জন্যই হোক ফিগারগুলি ছিল বিশাল। সেখানে পুরুষের যত টুকু পেশী দেখা যায় তা মূলত সুসমতা ও সৌন্দর্যের জন্যে। কিন্তু সুলতান বৃত্তাকার পেশী এঁকেছেন শক্তির চিত্রায়নের উদ্দেশ্যে। বৃত্ত ভারতীয় চিত্রকলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবয়ব, যা নির্দেশ করে পানি তথা জলকে – যা জীবনের প্রতীক। অন্যদিকে নারীর দেহ অজন্তা ও ইলোরার বুদ্ধ নারীদের আদলে আঁকা, যদিও বলিষ্ঠ নিতম্ব আমাদের এ অঞ্চলেরই ঐতিহ্য। কিন্তু গুপ্তযুগের মেদশূন্য নারীর অবয়বকে সুলতান আমাদের দেশজ নারীর অবয়ব মনে করেননি। তাই সচেতনভাবে তাঁর নারী অবয়ব পেশীবহুল এবং এই পেশী পরিশ্রম ও টিকে থাকার শক্তিকে নির্দেশ করে। তাছাড়া দেহের রং

চয়নের ক্ষেত্রেও তিনি বাদামী রং ব্যবহার করেছেন। তিনি মনে করতেন, আমাদের দেহ এবং মাটির রং বাদামী।

৬.৩ উপকরণ

ইউরোপে তৈল রং অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু আমাদের দেশের পরিবেশে তা অনুপযোগী। তার কারণ তৈল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাছাড়া, জয়নুল আবেদিন পাশ্চাত্যের রং ব্যবহারের সমস্যা নিয়ে বলেন, বাইরের রং এর মাধ্যমে কখনো আমাদের দেশীয় নৈসর্গ উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। সে কারণে সুলতান নিজেই ভেষজ থেকে রং তৈরি করতেন। সুলতান বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করেছেন জল রং, পরবর্তীতে কিছু কাল তৈল রং ও ব্যবহার করেছেন। শেষের দিকে দেশজ বিভিন্ন উপকরণ যেমন, দেশী-গুঁড়ার রং, গাবের আঁঠা ও তিষির তৈল প্রভৃতি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন।

৭. পরিশেষ

আত্মসত্তার অন্বেষণ রাজনীতি মুক্ত নয়, এবং ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রসঙ্গ উপেক্ষা করে আলোচনা সম্ভব নয়। সাইল মায়ারাম মনে করেন, তারপরও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো আত্মসত্তার অন্বেষণ এবং আত্মপরিচয় নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করতে পারে না। বিশেষত উপনিবেশোত্তর পর্বে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধের প্রয়োজনে। কিন্তু সেই আত্মসত্তার অন্বেষণ এবং আত্মপরিচয় নির্মাণে বিচারমূলক আলোচনা জারি রাখা প্রয়োজন। অন্যথায়, বঙ্গীয় পুনর্জাগরণবাদের আধ্যাত্মিকতানির্ভর আত্মসত্তান্বেষণের পুনবিচ্ছেদায়ন নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সুলতানের শিল্পকর্ম আত্মসত্তার অন্বেষণ ও আত্মপরিচয় নির্মাণ বি-বিচ্ছেদায়নের একটি প্রস্তাব। একই সাথে তা ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের একটি প্রতিবয়ান। সুলতানের বিউপনিবেশায়নের উদ্দেশ্য প্রাক-ঔপনিবেশিক মননে ফিরে যাওয়া নয়। তিনি মনে করতেন, প্রাক-ঔপনিবেশিক মননের সৃষ্টিশীল বৈশ্বিক রূপান্তর হচ্ছে বিউপনিবেশায়ন। বাংলাদেশ কখনো বৈশ্বিক রাজনীতি এবং অর্থনীতির কেন্দ্রও ছিল না। এমনকি ৭১-এর স্বাধীনতার পরও বিশ্বের এক প্রান্তিক রাষ্ট্র। সে কারণে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানচর্চা, সাহিত্য, শিল্পকলা বিভিন্নভাবে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সুলতান বাংলাদেশের আত্মসত্তার অন্বেষণ করেছেন। তিনি রাষ্ট্র নির্মাণের সম্ভাবনা দেখেছেন লোকজ সংস্কৃতিতে। যা ভিত্তি হতে পারে বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্বের এবং টেকসই উন্নয়নের। কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পরসিকদের অনেকেই পশ্চিমা চোখে দেখার কারণে সুলতানকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্যে গার্ফিল্ড বলেন, 'পশ্চিমা-দৃষ্টি ভারতীদের নন্দন ভাবনা এবং অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন ভাবে বিকৃত করেছে, তাই ভারতীয় শিল্পরসিকদের উচিত ভারতীয়-দৃষ্টি ব্যবহার- যা তাদের যর্থাথ ভাবে রস উপলব্দি ও উপভোগে সহায়তা করবে।' (Bhushan and Garfield, 2011: xix)

টীকা

1. The term 'antiquities' appears here as a distinctly Western cognitive entity with a specific nineteenth-century history, whose usage and deployment in colonial India would define the way antiquarianism would slowly prepare the grounds for new disciplinary specializations. As an all-encompassing denominationi (including everything from whole monuments to the smallest architectural fragments, from manuscripts to sculptures, coins, and inscribed slabs), the concept of antiquities becomes a marker of the period's persistent bid for complete, comprehensive knowledge that would thereafter allow the concept to be superseded, refined, particularized. (Guha-Thakurta, 2004: 2-3)

2. The last hereditary Welsh prince, Owain Gruffydd ap Gwenwynwyn, built Powis castle as a craggy fort in the 13th century; the estate was his reward for abandoning Wales to the rule of the English monarchy. But its most spectacular treasures date from a much later period of English conquest and appropriation: Powis is simply awash with loot from India, room after room of imperial plunder, extracted by the East India Company in the 18th century. There are more Mughal artefacts stacked in this private house in the Welsh countryside than are on display at any one place in India – even the National Museum in Delhi. The riches include hookahs of burnished gold inlaid with empurpled ebony; superbly inscribed spinels and jewelled daggers; gleaming rubies the colour of pigeon's blood and scatterings of lizard-green emeralds. There are talwars set with yellow topaz, ornaments of jade and ivory; silken hangings, statues of Hindu gods and coats of elephant armour. (Dalrymple,2015)

3. '… toform a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect.' [Macauley, 1835]

4. যিনি 'চিত্রবিদ্যা' নামে একটি বই লিখেন ১৮৭৪ সালে। যেখানে ধাপেধাপে ড্রয়িং এবং নৈসর্গিক অঙ্কনরীতি নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এটি বাংলাভাষায় লেখা পাশ্চাত্য অঙ্কনরীতি সম্পর্কিত প্রথম বই।

সহায়কপঞ্জি

ইসলাম, সৈয়দ মনজুরুল ও চৌধুরী, সুবীর সম্পাদিত (১৯৯৫) এস. এম. সুলতান স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

ইসলাম, আমিনুল (২০০৩) বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

ইসলাম, নজরুল (২০০৯) সমকালীন শিল্প ও শিল্পী, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

খান, সাদেক (২০০৩) এস. এম. সুলতান, সম্পাদনা: সুবীর চৌধুরী, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

গুহ, রণজিৎ (২০১০) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত, কলকাতা: তালপাতা।

চন্দ্র, বঙ্কিম 'আর্য্যজাতি সূক্ষ্ম শিল্প', বঙ্কিম রচনাসমগ্র (প্রথম খন্ড), অনলাইন সংস্করণ।

ছফা, আহমদ (১৯৯৫) 'অভিনব উদ্ভাসন', ইসলাম, সৈয়দ মনজুরুল ও চৌধুরী, সুবীর সম্পাদিত, এস. এম. সুলতান স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ৮৬-১০৫ ।

জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান (১৯৯৫) 'দেশজ ও আধুনিকতা: সুলতানের কাজ', ইসলাম, সৈয়দ মনজুরুল ও চৌধুরী, সুবীর সম্পাদিত, এস এম সুলতান স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ২৩-৪৯।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (২০০৫) বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (২০১২(১)) শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধনিচয় (প্রথম ভাগ), কলকাতা: দীপায়ন।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (২০১২(২)) শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধনিচয় (দ্বিতীয় ভাগ), কলকাতা: দীপায়ন।

তাহের, আবু (২০০৮) বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা এবং তিনজন শিল্পী (জয়নুল আবেদিন, এস. এম. সুলতান ও রশিদ চৌধুরী), ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

নিজার, সৈয়দ (২০১৩) 'যুক্তির উপনিবেশিকরণ' in *The Jahangirnagar Review*, Part-C, Vol. XXIV, pp 199-210.

ভদ্র, গৌতম (১৯৯৪) ইমান ও নিশান, কলকাতা: সুবর্ণরেখা।

মনসুর, আবুল (১৯৯৫) 'এস এম সুলতান: সৃজনশীলতা ও প্রান্তিক মানসের দায়', ইসলাম, সৈয়দ মনজুরুল ও চৌধুরী, সুবীর সম্পাদিত এস. এম. সুলতান স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ১৬৬-১৮৬।

রাজ্জাক, আবদুর (১৯৯৫) 'সুলতানের ছবি', ইসলাম, সৈয়দ মনজুরুল ও চৌধুরী, সুবীর সম্পাদিত এস. এম. সুলতান স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ১৩-১৪।

শাহাদুজ্জামান (১৯৯৪), সুলতানের সাথে আলাপ (শিল্পী এস এম সুলতানের সাক্ষাৎকার), ঢাকা: নৃ সিরিজ।

Bhushan, Nalini and Garfield, Jay L. Ed. (2011) *Indian Philosophy in English: From Renaissance to Independence*, London: Oxford University Press.

Bhabha, Homi K. (1994) 'The Mimicry and The Man' in *The Location of Culture*, London: Routledge.

Bowers, M. A. (2004) *Magic(al) Realism*, London: Routledge.

Bryant, Edwin F. & Patton, Laurie L Ed. (2005) *The Indo-Aryan Controversy: Evidence and Inference in Indian History*, London: Routledge.

Chatterjee, Partha (1998) The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism, Oxford (India): Oxford University Press.

Cotter, Holland (2008) '*Indian Modernism via an Eclectic and Elusive Artist*', in Newyork Times.

Coomaraswamy, Ananda (1910) 'Art and Swadeshi' reprinted in Bhushan, Nalini and Garfield, Jay L. Ed. (2011) *Indian Philosophy in English: From Renaissance to Independence*, London: Oxford University Press.

Coomaraswamy, Ananda (1924) *Visvakarma Examples Of Indian Architecture, Sculpture, Painting, Handicraft*, London; Messer Luzac.

Cooper, Frederik (2005) *Colonialism In Question; Theory, Knowledge, History*, Berkeley: University of California Press.

Dalrymple, William (2015) 'The East India Company: The original corporate raiders', in The Guardian Newspaper

Dhar, Parul Panday Ed. (2006) *Indian Art History: Changing Perspectives*, New Delhi: D.K. Printworld (P) Ltd.

Fanon, Frantz (1963) *The Wretched of The Earth*, Farrington, Constance Tr., New York: Grove Press.

Ghosh, Aurobindo (1918) 'The Renaissance in India' reprinted in Bhushan, Nalini and Garfield, Jay L. Ed. (2011) *Indian Philosophy in English: From Renaissance to Independence*, London: Oxford University Press.

Guha-Thakurta, Tapati (2004) *Monuments, Objects, Histories: institutions of art in colonial and postcolonial India*, New York: Columbia University Press.

Guha, Ranajit (1988) *An Indian Historiography of India: A nineteenth-Century Agenda and its Implication*, K P Bagchi & Company, Calcutta, New Delhi.

Jones, William (1799) 'The Third Anniversary Discourse on the Hindus', Delivered 2 February, 1786,' in *The Works of Sir William Jones*, vol. I, London: Robinson and Evans, as given in Lehmann, Winfred P., 1967. *A Reader in Nineteenth Century Historical Indo-European Linguistics*, Indiana University Press, pp. 7-20.

Havell, E. B. (1908) *Indian Sculpture and Painting*, London: Johan Murryay.

Havell, E. B. (1913) *Indian Architecture: Its Psychology, Structure and History from the first Muhammadan Invasion to the Present day*, London: Johan Murryay.

Havell, E. B. (1920) *The Ideals of Indian Art*, London: Johan Murryay.

Kopf, David (1969) *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835*, University of California Press, Berkley and Los Angeles.

Mayaram, Shail (2004) *Against History, Against State: Counterperspectives from the Margins*, Columbia: Columbia University Press.

Macauley, Thomas B. (1835) Minute on Education Columbia University. http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html

Mccarthy, Cameron and Dimitriadis, Greg (2000) 'Art and the Postcolonial Imagination: Rethinking the Institutionalization Third World Aesthetics and Theory', in A Review of International English Literature, 31:1&2, Jan.- Apr.

Said, Edward (1995[1978]) *Orientalism*, New York: Penguin Books.

Stokes, Eric (1990) *The English Utilitarians and India*, New Delhi and Oxford: Oxford University Press.

Thiong'o, Ngugi Wa (2007) *Decolonising the Mind*, Worldview Publications, Delhi.

Tucker, Robert Ed. (1975) *The Marx-Engels Reader* (2nd Edition), New York: Princeton University Press.

Young, Robert J. C. (2003) *Postcolonialism: A very Short Introduction*, London: Oxford University Press.

Painting:

Varma,Raja Ravi(1893) A portrait of Mahaprabha Thampuratti of Mavelikkara; from http://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Ravi_Varma

Tagore, Abanindranath(1905) *Bharat Mata* from http://www.kamat.com.htm.

সুলতান, এস. এম. (১৯৭৬) প্রথম বৃক্ষ, খান, সাদেক (২০০৩), এস. এম. সুলতান, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।